দ্বাদশ ব্যক্তি

মতি নন্দী

ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
শ্রীরণজিৎ কুমার সামুই
বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স
৮৩-বি বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ফাল্গুন, ১৩৬৭ (মার্চ, ১৯৬০) আনন্দবা
দোল সংখ্যায়।

গৌরকিশোর ঘোষ-কে

॥ এক ॥

সকালে ঘুম থেকে উঠতে তারক সাতটা বাজিয়ে ফেলেছে। আটটার মধ্যে তিনবার সে কলঘরে গেছল।

উঠোনের একধারে, কলঘরের বাইরের দেওয়ালের লাগোয়া নর্দমা পুরুষদের জন্য। প্রথমবার তারক ওখানে গিয়েই বসে। জ্বালা করে ওঠায় ঘাবড়ে গিয়ে সে দেখতে চেষ্টা করে পুঁজ বেরোচ্ছে কিনা। কিন্তু হাতদশেক দূরেই বঙ্কুবিহারী রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলছে টুলে বসে।

কলঘরের ওধারে হাত ছয়েক ফালি জায়গাটায় দেওয়াল তুলে অ্যাসবেসটাসের ছাউনি দিয়ে রান্নাঘর হবে। বৈঠকখানাটার সঙ্গে এই রান্নাঘর পঞ্চান্ন টাকায় ভাড়া নেবে বলে একজন তিনমাসের অগ্রিম দিয়ে গেছে। তারক ভরসা পেলনা বঙ্কুবিহারীর সামনে এইভাবে মাথা নিচু করে দেখার চেষ্টা করতে। হয়তো ধমকে উঠবে—"অ্যাই কি হচ্ছে ছোটছেলেদের মত ?"

দ্বিতীয়বার দেখবার চেষ্টা করার জন্য তারক কলঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। বঙ্কুবিহারী তখন মিস্ত্রিকে নিয়ে ছাদে গেছে, সেখানে রাখা পুরনো ইঁটগুলো দেখাতে। কলঘরের ভিতরটা অন্ধকার। তারক ঘাড় হেঁট করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও বুঝতে পারল না পুঁজ বেরোচ্ছে কিনা। তবে টের পাবার জন্য কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে আবার পেচ্ছাপ করল এবং জ্বালা করে উঠতেই বিমর্ষ হয়ে ভাবল,—তাহলে বোধ হয় হয়েছে।

এই সময় গজগজ করতে করতে বঙ্কুবিহারী নেমে আসছে বুঝেই সে তাড়াতাড়ি কলঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল, আর, যেন এই নির্মীয়মান রান্নাঘরটি ভাকরা-নাংগলের মত বিরাট

এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার, ভঙ্গিটা সেইরকম করে তাকিয়ে থাকল। সিমেণ্ট আর বালি মিশিয়ে জল ঢেলে তাগাড় মাখছে মজুরটা। একটা সিমেণ্টের ডেলা ছিটকে তার পায়ের কাছে আসতে সেটায় লাথি মারতে গিয়ে দেখল বঙ্কুবিহারী এসে পড়েছে। তারক নিচু হয়ে ডেলাটা কুড়িয়ে তাগাড়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

"আদ্দেক ইঁট নাকি চলবে না।" বঙ্কুবিহারী বিরক্ত হয়ে বলল।

ওকে খুশি করার জন্য অভ্যাসবশতই তারক যথোচিত অবাক হয়ে বলল,—"কেন, সবগুলোই তো আস্ত রয়েছে!"

"না বাবু, বেশির ভাগই পচা। কর্নিক মেরে তো দেখলুম ঝুরঝুর করে ভেঙ্গে পড়ছে। আরো পঞ্চাশটা ইঁট এখনি আনিয়ে দিন।" মিস্ত্রি বিনীতভাবে বললেও বঙ্কুবিহারীকে চুপ করে থাকতে দেখে তারক বেশি অবাক হবার জন্য আর এগোল না। পঞ্চাশটা ইঁট কিনে আনতে তাকে দোকানে যেতে হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। শস্তায় ভাল ইঁট কেনার ক্ষমতা ছেলের নেই, সংসারের সাশ্রয় হয় এমন কোন কাজেরই যোগ্যতা নেই, বঙ্কুবিহারী নিশ্চয় এখন, গত পনেরো বছর যাবত ঘোষিত সিদ্ধান্তটি বদলাবে না।

তারক সিঁড়ির দিকে এগোতেই বঙ্কুবিহারী বলল, "বৈঠকখানা চূণকাম হয়ে গেলে যদি চূণ বাঁচে তাহলে তোর ঘরটা করিয়ে দোব।"

তারক ঘাড় নেড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে, কি ভেবে ফিরে বলল, "একটু বেশি করে চূণ গুললেই তো হয়। তোমার ঘরটাও তাহলে হয়ে যায়।"

"বললেই তো হয় না, পয়সা লাগবে তো। একটা ঘর মানেই একদিনের মজুরী।"

তারক তাড়াতাড়ি উঠে এল দোতলায়। রান্নাঘরটা দোতলায়ই সিঁড়ির পাশে। আগে একতলায় ছিল। কিন্তু একতলার তিনটি

ঘর পাঁচিল তুলে আলাদা করে সাত বছর আগে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। মাসের তিন তারিখে বঙ্কুবিহারী নব্বই টাকা পায়। ভাড়াদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। এমন কি প্রায় এক মাস ওদের কারুর মুখ পর্যন্ত দেখেছে বলে তারকের মনে পড়ে না। তারকদের এখন গলির মধ্য দিয়ে পিছনের দরজাটাকেই সদর হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। আবার একঘর ভাড়াটে বসিয়ে একতলার একমাত্র ঘরটিকেও লোপাট করার সিদ্ধান্ত যখন বঙ্কুবিহারী নেয়, তারক খুবই আপত্তি তুলেছিল মনে মনে। শুধু বঙ্কুবিহারীকে একবার বলে, "বাইরের লোকজন এলে বসবার একটা ঘর ছিল। সেটা আর থাকবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কুবিহারী খেঁকিয়ে উঠে বলেছিল, "বাইরের লোক-জন কত যেন আসছে। আসে তো তোর শ্বশুরবাড়ির লোক। তাদের ওপরের ঘরে এনে বসানোও তো যায়। বৌমার আবার সন্তান হবে, খাবার আর একটা মুখ আসছে, আয় বাড়ানোর কথা ভাবতে হবে না? বছর বছর ক'টাকাই বা তোর মাইনে বাড়ে। দিনকাল কি পড়েছে সে হুঁশ আছে? এখন এক টাকা আশিতে চাল বিকোচ্ছে, যখন পাঁচ টাকা হবে তখন ওই ক'টা মাইনের টাকায় কি বাপু চালাতে পারবে? যদি বলিস পারব তাহলে বৈঠকখানা থাক, বাইরের লোকজন আসুক তাকিয়া ঠেশ দিয়ে গপ্পোগুজব কর।"

বঙ্কুবিহারী মিটমিট করে তাকিয়েছিল। তারক কথা না বলে নিজের ঘরে এসে ঢোকে। রেণু যেন ওৎ পেতেই ছিল।

"এসব নিয়ে তুমি কেন বাবার সঙ্গে কথা বলতে গেছ। ওঁর বাড়ি, উনি যা খুশি করবেন, তাতে তোমার কি?"

"যা বোঝনা, তা নিয়ে কথা বোলোনা। বাইরের লোককে কেউ শোবার ঘরে এনে তোলে না, ওসব তোমাদের বাড়িতেই চলে।"

"বেশ তো তোমাদের বাড়িতে নয় এসব চলে না, তাই বলে আমার বাপের বাড়িতে ভাড়াটে বসানোরও দরকার হয় না। বাবা এইমাত্র যা বলল, তা মনে করে দেখ।"

তারক্ শুধু তাকিয়ে রইল রেণুর দিকে। পোয়াতির পেট এবং পাছার মধ্যে লাথি কষাবার উপযুক্ত কোনটি, কয়েক মুহূর্তের জন্য সেই স্থান নির্বাচনের সমস্যায় সে পড়ে গেল। কিন্তু এই সমস্যাটার মত বহু সমস্যাই তার মনে ইতিপূর্বে দেখা দিয়ে অসমাধিতই রয়ে গেছে। এটিরও তাই হল। শুধু্ ঝনঝন করে মাথার মধ্যে একটা রেশ বেজে চলল।

ঘরে বসে তারক সেই রেশটা এখন অনুভব করল হঠাৎই। কলঘরে যাওয়ার দরকার কি, ঘরের দরজা বন্ধ করে দেখে নিলেই তো হয়! রাস্তার দিকে খোলা জানলা দুটোর দিকে সে তাকাল। পর্দাটা টেনে দেওয়া হয়নি, সামনের বাড়ির সুধাংশুদের ঘর থেকে এঘরের সবই দেখা যায। জানালাগুলো বন্ধ করে দিতেই ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। তখন সে আলো জ্বালল এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত লজ্জা তাকে পেয়ে বসল।

পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে হলে তার কোনরকম সঙ্কোচই হত না। কিন্তু এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এইভাবে বন্ধ ঘরে আলো জ্বালিয়ে এমন একটা ছেলেমানুষী কাজ করতে গেলে যে তার চোর-চোর ভাব দেখা দেবে সেটা তারক বুঝতে পারেনি। মোটামুটি নিজেকে নিয়ে তার হাসি পেয়ে গেল। এমন সময় দরজার ওপাশে বঙ্কুবিহারীর গলা শুনতে পেল। তাকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি জানালাগুলো খুলে দিয়ে, আলোটা নিভিয়ে তারক দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

"দরজা বন্ধ করে কি কচ্ছিলি ?" বঙ্কুবিহারী ভ্রূকুটি করল।

"কিচ্ছু না।" থতমত হয়ে তারক একটা কারণ আবিষ্কারের জন্য চারধারে তাকাল।

"বৌমাকে কখন আনবি, রাত্তিরে?"

"অফিসের পর যাব।"

"তাহলে রাতে খেয়েই তো আসবি। ইটের দোকানে যাচ্ছি, যাবার পথে গয়লাকে বলে যাব, কাল সকাল থেকেই যেন দেড়সের করে দেয়। বৌমাকে বলে দিস, আসার সময় বাচ্চা দুটোকে যেন দুধ খাইয়ে আনে। নিচে গিয়ে একটু দাঁড়া, আমি দশ মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি।"

বঙ্কুবিহারীর সঙ্গেই একতলায় নেমে এসে তারক রান্নাঘরের দেয়াল তৈরীর কাজ তদারক করতে দাঁড়িয়ে থাকল এবং বঙ্কুবিহারী হঠাৎ ফিরে আসবে না ধরে নিয়েই সে গত এক ঘণ্টার মধ্যে তৃতীয়বার কলঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

আর সঙ্গেসঙ্গে চার বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল তারকের। তাইতে আর ইচ্ছা করল না কলঘরে ছেলেমানুষ হতে। বেরিয়ে এসে টুলে বসল, বসে মনে করতে চেষ্টা করল-- সেদিন অমুকে নিয়ে বাবার সঙ্গে খিটিমিটি হয়েছিল। ছেলের কাশি হচ্ছে দু'দিন ধরে অথচ ডাক্তার দেখাচ্ছি না, এই নিয়ে বাবা এন্তার কথা বলে। তখনই ঠিক করি অহীনকে গিয়ে দেখিয়ে আসব। গেলাম অমুকে নিয়ে। গিয়ে বসেছি মাত্র, তখন—

"আবার রোগে ধরেছে ডাক্তার, ইঞ্জেকসান লাগাও।" পুলকদা চেঁচিয়ে কথাগুলো বলতে বলতে অহীনের ডাক্তারখানায় ঢুকল। হাতে পেনিসিলিনের শিশি আর ডিস্টিল ওয়াটারের অ্যাম্পুল। কয়েকজন রোগীও সেখানে ছিল।

"আপনাকে নিয়ে আর পারা যাবে না। এই নিয়ে কবার হল?" অহীন যথাসম্ভব গম্ভীর হবার চেষ্টা করতে লাগল। দু'বছর

হল পাশ করে, বাড়িতেই ঘর সাজিয়ে বসেছে। হাফপ্যাণ্ট পরে যখন ও গলিতে ক্যাম্বিস বল খেলত, পুলকদা রেফারী হত।

অহীনের কথাগুলো যেন শুনতেই পেল না পুলকদা, অমুর দিকে তাকিয়ে আমায় বলল,—"তারকা এটা কে রে, তোর ব্যাটা নাকি। বাঃ বেশ দেখতে হয়েছে তো। নাম কি রে তোর?"

অহীন রোগী দু'জনের দিকে মন দিল। পুলকদা অমুর সঙ্গে ভাব জমাতে জমাতে বলল, "এটাকে খেলা শেখাবি। তুই তো রঞ্জি ট্রফিতে একবার টুয়েলফথ্ ম্যান পর্যন্ত পৌঁছে আর তো এগোতেই পারলি না। নিজে যা পারলি না এইবার ছেলেকে দিয়ে ছাখ্ না করাতে পারিস কি না।"

বললুম, "কি করাব ওকে দিয়ে?"

বলল, "টিমে ঢোকাবার জন্য তৈরী করা। আসল এগারো জনের টিমে ফালতু হয়ে বল কুড়িয়ে কুড়িয়ে কি ইজ্জৎ পাওয়া যায়? শেষমেশ বরাতে জুটবে তো গালাগাল। মনে আছে রে, হেমু অধিকারীর ক্যাচটা ফেলার পর কি খিস্তি খেয়েছিলি তুই? হারা ম্যাচটাকে জিতিয়ে নিয়ে গেল সেঞ্চুরী করে।"

এর জবাবে বললুম, "ইঞ্জেকসান নিচ্ছেন যে, হয়েছে কি?"

বলল, "আর কি, তোরা তো আমার বিয়ের ব্যবস্থা করলি না, তাই পয়সা খরচ করে ঠিকেবৌ যোগাড় করি। তাদেরই কেউ ভালবেসে রোগ দিয়েছে।" পুলকদা গলা না চেপে, অপরাধীর ভাব না ফুটিয়ে এভাবে এইসব কথা কি করে বলতে পারল ভেবে অবাক লেগেছিল। অহীনকে বিব্রতই দেখাল। সে তাড়াতাড়ি রোগী দেখা বন্ধ রেখে ইঞ্জেকসানের ব্যবস্থা শুরু করল, পুলকদাকে বিদায় করতে।

"পাড়ার ডাক্তার হলে কত সুবিধে, ফী লাগে না।" ইঞ্জেকসান নেবার সময় পুলকদা হাসতে হাসতে বলেছিল।

"আবার যদি হয়, তাহলে ফী চাইব।"

"দোব।" গা ঝাড়া দিয়ে পুলকদা উঠে দাঁড়াল। "তাহলে ওবেলা ঠিক আটটায় আসছি। থাকবি তো?"

"যদিনা কলে বেরোই।"

"এই দ্যাখ আবার কি ফ্যাসাদের কথা বললি। আটটার সময় বারোঘন্টা যে কাবার হয়ে যাবে। ওষুধের গুণ তো তাহলে কেটে যাবে!"

"কত তো ডাক্তারখানা রয়েছে, কোথাও থেকে নিয়ে নেবেন। ফূর্তি করতে পয়সা খরচ করেন আর এর বেলা বুঝি গায়ে লাগে।" অহীনের হেসে বলা কথাগুলোর মধ্যে রাগ ও বিরক্তি মেশানো পেশাদারি ঝাঁঝটা স্পষ্টই কানে বাজল।

পুলকদা গায়ে না মেখে বরং চোখেমুখে ভয়ের ভাব ফুটিয়ে বলল, "ওরে ব্বাপ! কি হয়েছে মশাই, কেন হল, কি করে হল, কোত্থেকে হল—সে এন্তার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। সত্যি বলতে কি এসব উত্তর দিতে গেলে, মাথা গরম হয়ে যায়। অপরিচিত উটকো লোককে প্রাইভেট ব্যাপার কি বলা যায়? তোর কাছে তো এসব ঝামেলা নেই।

"তা তো নেই, তবে বারবার এসব হয় কেন, সাবধান হতে পারেন না?"

"দূর দূর, এমন এক সস্তার দাওয়াই বার করে গেছে ফ্লেমিং সাহেব আর আমি কিনা সুখ থেকে বঞ্চিত হই! বিয়ে কর বুঝতে পারবি সব। এই তো তারকাটা ছেলের বাপ হয়েছে ওকেই জিজ্ঞেস করে ছাখ, বলো না গো···"

"আচ্ছা আচ্ছা খুব হয়েছে, এখন আসুন তো।"

বেরিয়ে যাবার আগে পুলকদা অমুর গাল টিপে বলে যায়, "টেস্ট খেলতে হবে, বুঝেছ?"

অমুর তখন এক বছর বয়স।

পুলকদা গত বছর আফিম খেয়ে মরে গেছে। কারণটা কেউ জানে না। অহীন বিয়ে করেছে, ছেলেপুলে হয়তো হয়েছে। বিয়েতে নেমন্তন্ন করেনি। করার মত অতখানি আলাপও এখন নেই। আর না থাকলে গিয়ে বলাও যায় না—অহীন রোগে ধরেছে। ইঞ্জেকসান লাগা।

"বাবু কে একজন ডাকছে।"

তারক চমকে মজুরটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

"গলিতে কে একজন ডাকছে অনেকক্ষণ।"

তারক ব্যস্ত হয়ে টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে ধপ করে বসে পড়ল। ডান পা ঝিঁঝিঁ ধরে অসাড় হয়ে গেছে।

"কে? কাকে চাই, এদিকে আসুন।" চীৎকার করল তারক।

"আমি নারান।"

"দরজা খোলাই আছে, এস।" তারক ডান পায়ের পাতায় টোকা দিল। গোটা শরীর ঝনঝন করে উঠতেই সে ভাবল, ইঞ্জেকসান নিলেই যখন সারিয়ে ফেলা যায় তখন আর চিন্তা কেন! প্রফুল্ল চিত্তে সে নারানকে দেখামাত্রই বলল, "আমার মনে আছে, মনে আছে। তোমার আবার আসার দরকার ছিল না।"

"বলেছিলেন মাসের গোড়ার দিকে একবার দেখা করতে।" নারান নামক বাইশ-তেইশ বছরের যুবকটিকে কাঁচুমাচু দেখাল। তাইতে তারক তৃপ্ত বোধ করল।

"তুমি বরং আজ দুটো-তিনটে নাগাদ আমার অফিসে এস। যদি আজই ইণ্টারভিউয়ের চিঠিটা বার করে দিতে পারি তাহলে হাতে হাতেই দিয়ে দোব। চেনো তো অফিসটা?"

"চারতলায়, স্টাফ সেকশান। আমি তো একবার গিয়েছিলাম।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, থার্ড ফ্লোর। তাহলে দুটো-তিনটেয়, কেমন?"

নারান চলে যাওয়ার পরও ঝিঁঝিঁ ছাড়েনি। খানিকক্ষণ বসতে হবে। তাই তারক হাঁক দিল, "দেবু, আজকের কাগজটা দিয়ে যাও তো।"

দোতলা থেকে কাগজ দিয়ে গেল দেবাশিস। নদীয়ার এক উদ্বাস্তু কলোনীতে ওর বাবা মা ভাই বোন মিলিয়ে পাঁচজন থাকে। কলকাতায় সরকারী অফিসে পিওনের কাজ করে, খাওয়া-থাকা তারকদের বাড়িতে। বিনিময়ে বাসন মাজা ছাড়া সব কাজই করে অফিস যাওয়ার আগে এবং ফিরে এসে। রেণু থাকলে অবশ্য রাঁধতে হয়না। ওকে বঙ্কুবিহারীই যোগাড় করেছে। এমন ভদ্রলোকের মত দেখতে, চালচলন মার্জিত, স্কুল ফাইনালও পাশ, তাকে প্রথম উবু হয়ে ঘর মুছতে দেখে তারক অস্বস্তি বোধ করে। রেণু আঙুল দিয়ে আলমারির তলাটা দেখিয়ে বলছিল, "ওর তলাটা যে মোছা হল না। আগে যে লোকটা ছিল তাকে প্রথম দিন যা যা বলে দিয়েছিলুম, ঠিক করে যেত। একদিনও আর ফিরে বলতে হয়নি।"

তারক চোখ টিপে, ভ্রু কুঁচকে রেণুকে চুপ করতে বলেছিল। রেণু অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "কেন?" দেবাশিস কাজ শেষ করে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তারক কথা বলেনি।

"ভদ্রঘরের ছেলে, তার সঙ্গে একি ধরণের কথা! ও কি চাকর? কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় শেখোনি?"

"ও তবে কী? কিভাবে কথা বলব।"

রেণুর বিস্ময়ে বিন্দুমাত্র খাদ না পেয়ে তারকের মাথার মধ্যে ঝনঝন করে উঠেছিল। ঘর থেকে তখুনি সে বেরিয়ে যায়। বঙ্কুবিহারীকে সেইদিনই বলে, "চাকরবাকর ক্লাশের কাউকে রাখলেই তো ভাল হত।"

"ও কি দয়া করে কাজ করে দিচ্ছে?" দুবেলা খাওয়া-থাকা, হিসেব করে ছাখ্‌তো কত হয়।"

"তাহলেও ভদ্রঘরের ছেলে, শিক্ষিতও—"

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কুবিহারী খেঁকিয়ে উঠেছিল, "দিনকাল যা পড়েছে আর ভদ্দরলোক থাকতে হবে না। শিক্ষিতও তো কত দেখলুম। তিনবারে আই এ পাশ করে এখন তুই ওকেই ভাবছিস শিক্ষিত। মোল্লার দৌড় আর কদ্দুরই বা হবে।"

অবশ এবং মাটিতে মিশে যাওয়া তারককে ফেলে চটি ফটফটিয়ে বঙ্কুবিহারী চলে যায়। তারক তখন প্রাণপণে মাটি থেকে ওঠার চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু দেবাশিসকে 'দেবু' বলা ছাড়া আর উঠতে পারেনি।

তারক মাটিতে ডান পা ঠুকে দেখল ঝিঁঝিঁ একদম নেই। ইঞ্জেকসান নিলে এইভাবেই সেরে যাবে রোগটা, ভাবতে ভাবতে সে কাগজ খুলে আইন-আদালতের খবর বার করল। প্রতিদিনই পড়ে, পড়তে ভাল লাগে।

আজকের প্রথম খবরটা তহবিল তছরুপের। পড়েই বুঝল ক্যাশিয়ারটা অবধারিত জেল খাটবে। পঞ্চান্ন হাজার টাকার বদলে তিন কি পাঁচ বছরের জন্য যদি জেলে যেতে হয়, মন্দ কি! তারক ভাবল, এমন সুযোগ পেলে কিছুতেই সে ছাড়ত না। তবে ফিরে এলে, পাড়ার লোকেরা কি রেণুর বাবা-দাদারা নিশ্চয় খুব ছ্যা ছ্যা করবে।

তারক পরের মামলার খবরটায় চোখ বোলাল। এটাকে অতি বাজে বলে তার মনে হল। একটা মন্দিরের প্রণামীর টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপার। রিসিভার বসানো হয়েছে। তারক ভাবল দিনে কতই বা প্রণামী জমে যে তার ভাগ নিয়ে আবার মামলা হয়!

পরের মামলাটা খুব ছোট্ট করে বেরিয়েছে। একটি স্ত্রীলোক তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে—তাকে বিয়ের সাত বছর আগে লোকটি আর একটি বিয়ে করেছে এবং সে বৌ এখনো বেঁচে। দুটি ছেলেও আছে। সে কথা গোপন করে অর্থাৎ ঠকিয়ে লোকটা তাকে বিয়ে করেছে। শুনানী মুলতুবী আছে।

এই ধরনের ব্যাপার কি করে লোকটা সাত বছর চালিয়ে গেল? তারক ভেবে দেখল, দুটো সংসার চালাতে লোকটার নিশ্চয় কমকরে হাজার টাকা মাসে খরচ হয়। তাছাড়া সাত বছর ধরে প্রথম বিয়ের কথাটা দ্বিতীয় বৌয়ের কাছে লুকিয়ে রাখার জন্য লোকটাকে মারাত্মক পরিশ্রম করতে হয়েছে। এইভাবে জীবনযাপন করে লোকটা সুখে থাকতে পেরেছিল কি? তারকের মৃদু ইচ্ছা হল, এইরকম একটা মামলা রেণুর নামে করতে। ওর পূর্ব স্বামী আছে সেটা গোপন করে বা ডিভোর্স না করেই সে বা ওর বাবা-দাদারা (ছ্যা ছ্যা করা বার করে দোব) বিয়ে দেয়। কিংবা এমন মামলাও তো করা যায়, রেণুর ছেলে (তবে অমু নয়), ছোটটা যার বয়স এখন দেড় মাস— ওর বিয়ে করা স্বামীর অর্থাৎ তারক সিংহের ঔরসে জন্মায়নি। অতএব বিবাহ বিচ্ছেদ করা হোক।

ভাবতে গিয়ে তারক ক্রমশই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। প্রমাণ করতে হবে যে রেণু অসতী। কিন্তু কার সঙ্গে তার অবৈধ যৌন সংসর্গ হয়েছিল আদালত যখন তা জানতে চাইবে লোকটার নামতো বলতেই হবে। হঠাৎই তারকে মনে হল, সেই লোক দেবাশিস হলে কেমন হয়। কিছুক্ষণ সে হতভম্বের মত মিস্ত্রির দেয়াল গাঁথার কাজ দেখল ধাক্কাটা সামলাতে। তারপর লজ্জায় মাথা নামিয়ে কাগজে চোখ রাখল। দেবু সম্পর্কে এই রকম মনে হওয়ার জন্য নিজেকে তার কিছুক্ষণ ধরে খারাপ লাগল।

বারো বছরের নাবালিকার উপর পাশবিক অত্যাচারের

খবরটাতেও তারকের বিমর্ষতা কাটল না। একঘেয়ে গল্প। ছোটবেলায় কাগজে যা পড়েছে এখনো তাই। ওদের বয়স সব সময় বারো। ওরা কিছু জানত না। লোকটা ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘরে এনে দরজা বন্ধ করে কিংবা রিক্সায় তুলে,নিয়ে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ধর্ষণ বা বলাৎকার বা পাশবিক অত্যাচার করে। শ্লীলতাহানিও কখনো কখনো লেখা হয়। তবে বয়স্ক মেয়েদের ক্ষেত্রেই শ্লীলতাহানি কথাটা বেশি দেখা যায়। তারপর ওর মা বা পাড়ার লোকেরা পুলিশের সহায়তায় উদ্ধার করে। বাবা-র উল্লেখ কদাচিৎ তারকের চোখে পড়েছে।

গলিতে বঙ্কুবিহারীর চটির আওয়াজ হতেই তারক কাগজটা মুড়ে উঠে দাঁড়াবার আগে চট করে দেখে নিল—'আসামী বালিকাটির উপর তিনবার পাশবিক অত্যাচার করে।'

"ইঁট আসছে। কই কদ্দুর এগোল। অ্যাঁ এতক্ষণে এই হয়েছে।" বঙ্কুবিহারী মিস্ত্রি খাটাতে বসে গেল। তারক উপরে উঠে এল। দাড়ি কামিয়ে, চান খাওয়া করে নটা পনেরোয় তাকে ট্রামে উঠতেই হবে।

দাড়ি কামাবার সময় একটা ব্যাপার তারকের মনে পড়ে গেল। —বছর এগারো আগে একদিন মা বলল, "হ্যাঁরে তারক, তোর নামের আগে এটা কি লেখা?"

খবরের কাগজ হাতে মা পাশে এসে দাঁড়াল। ঠিক এইখানে। এইভাবেই দাড়ি কামাচ্ছিলুম। জানি কি লেখা আছে। আয়না থেকে চোখ না সরিয়েই বললুম, "দ্বাদশ ব্যক্তি, টুয়েলফথম্যান।"

"তার মানে? তোকে নাকি খেলায় নেয়নি?"

"কে বলল?"

"সরলের মা শুনে এল, দত্তদের বাড়ির মেজ ছেলে বলছিল।"

বলতে পারতুম বাজে কথা বলেছে। কাগজে নাম বেরিয়েছে

বলে হিংসে হয়েছে। তাতে মা খুশিই হতো। মাকে খুশি করা সব থেকে সহজ ছিল। কিন্তু তার বদলে বললুম, "এগারজনকে নিয়ে তো দল হয়, কিন্তু কারুর যদি হঠাৎ অসুখ করে কি চোট পায় তাহলে কি হবে? তখন দ্বাদশব্যক্তি তার জায়গায় খেলবে। একে কি দলে না নেওয়া বলে?"

দেখলুম মার মুখ থেকে উৎকণ্ঠা ঘুচে গেল। দেখে ভাল লাগল।

"আমায় নিয়ে যাবি?" মুখ ঘুরিয়ে লাজুক হয়ে মা বলল। এই সময় আমার বুকের মধ্যেটা নিংড়ে উঠল, হাত কাঁপল, আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকাতে ভয় করল। বললুম, "কোথায়?"

"তোর খেলা দেখতে। একদিনও তো দেখলুম না।"

ইচ্ছে হলে রূঢ়ভাবে বলি, খেলার তো কিছুই বুঝবে না, তবে দেখে কি হবে। বোকার মত পাঁচ-ছ' ঘণ্টা বসে থাকার কি দরকার। কিন্তু বললুম, "এ খেলাটা থাক। পরে একটা খেলায় নিয়ে যাব।"

"কেন, এটাতেই নিয়ে চল্ না।"

কথা না বলে দাড়ি কামাতে লাগলুম। জবাব না পেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মা চলে গেল। তখন আয়নাটাকে ঘুঁষি মেরে ভেঙ্গে দিতে ইচ্ছা হয়। দ্বাদশব্যক্তি, যে দলের বাইরে, যার কাজ ফেউয়ের মত দলের পিছনে ঘোরা, যে ব্যাট করতে পারবে না, বল করতে পারবে না, শুধু খাটুনি দিতেই যার ডাক পড়ে, যার কোন ক্ষমতাই নেই দলকে বাঁচাতে, যাকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেও আনবে না সেই সাধারণ অতি সাধারণ, দ্বাদশব্যক্তি। যে এগারোজনের মধ্যেও পড়ে না তার মা কি জন্য যাবে খেলা দেখতে? গিয়ে দেখবে একজনও তার ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে না—টি, সিন্‌হা যতক্ষণ উইকেটে আছে কোন ভাবনা নেই। কিংবা—সিন্‌হা আউট। এবার তাহলে ইনিংস শেষ।

থুতনি জ্বালা করে উঠতে তারক ব্যস্ত হয়ে আয়নার খুব কাছে

মুখ এনে দেখল, লাল সূতোর মত রক্তের দাগ। নীচ থেকে বঙ্কুবিহারী চেঁচাচ্ছে, "কাগজটা পাঠিয়ে দে রে তারক, আমার পড়া হয়নি।"

খবরের কাগজটা খাটের উপর থেকে নেবার সময় তারক আর একবার ছবিটার দিকে তাকাল। বাংলার রঞ্জি ট্রফি দল। পিছনে সাতজন দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে তারক এক কোণে। দুটো হাত অন্যদের মতই বুকে আড়াআড়ি রাখা। ছবির তলায় সকলের নাম লেখা। তারকের নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে দ্বাদশব্যক্তি কথাটি। ঠিক মাঝখানে চেয়ারে বসে অরুণ মিত্তির। ওর নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে ম্যানেজার লেখা। ছবিটা বাঁধিয়ে মা আয়নার উপরে পেরেকে ঝুলিয়ে দেয়। এক তলায় নামার সময় তারক গামছাটা টেনে নিল বারান্দা থেকে। কাগজটা বঙ্কুবিহারীকে দিয়ে সে চান করতে কলঘরে ঢুকল। তখন সে ভাবছে, ছবিটা তো খুলে ফেলতেই হবে। কলি করার জন্য গোটা ঘরের জিনিষই যখন বার না করে উপায় নেই।

॥ দুই ॥

অফিসে বেরোবার সময় দেয়াল ঘড়িটার সঙ্গে হাতঘড়ি মিলিয়ে তারক দেখল দু' মিনিটের তফাৎ। কাল ছিল চার মিনিটের। দেয়ালঘড়িই গোলমাল করছে। কিন্তু বঙ্কুবিহারী ছাড়া ওটায় হাত দেবার অধিকার কারুর নেই। ঠাকুর্দার আমলের ঘড়ি। ওই আমলের একজোড়া হরিণের শিং আর তিনটি পূর্বপুরুষের ছবি সে নিজের ঘরে রেখেছে। সিন্দুকটা বঙ্কুবিহারীর নিজের কেনা। ওর মধ্যে প্রচুর কাগজ আর স্ত্রী এবং পুত্রবধূর গয়না রাখা আছে। কাগজগুলো কিসের তারক তা জানে না। তবে বাড়ির দলিল এবং কোম্পানীর কাগজ ওর মধ্যেই আছে সেটা অনুমান করতে পারে। বাড়িটা বঙ্কুবিহারীর নিজের নামেই। ট্যাক্স আর ইলেক্‌ট্রিক বিল ওর নামেই আসে। লোকে বৌয়ের নামেই বাড়ি করে। মরে গেলে বিধবাকে যাতে ছেলে-বৌরা হেনস্তা করতে না পারে তারই রক্ষাকবচ। কিন্তু বঙ্কুবিহারী যেন ধরেই নিয়েছিল তার ছেলে মাতৃভক্ত হবে।

নিজের ঘরের দরজায় তারক তালা দিল। রেণু না থাকলে, এইটাই বঙ্কুবিহারীর নির্দেশ। বেরোবার সময় বঙ্কুবিহারী বলল, "দক্ষিণেশ্বর যাবি তো ওবেলা?"

"হ্যাঁ।"

গলির মোড় ঘুরতেই দেখল নির্মল চাটুজ্যে ব্যাজার মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে। তারক বলল, "অফিস যাবেন না?"

"আর অফিস যাওয়া। কাল রাত্তির থেকে পাইখানাটা বুঁজে আছে, ধাঙ্গড়টাকে বললুম তো ব্যাটা বলে, একটাকা লাগবে।

"তা কাল থেকে চালাচ্ছেন কি করে?"

"ওই কোনরকমে ওর ওপরেই। বারো আনা পর্যন্ত দোব বললুম রাজি হল না।"

"সবাই রেট বাড়াচ্ছে। ওই বা কেন ছাড়ে।"

তারক আর দাঁড়াল না। আর একটা মোড় ঘুরতেই মুখোমুখি হল অহীনের নতুন মোটরগাড়িটার। গলি জুড়ে ওদের দরজায় দাঁড়িয়ে। কেউ উঠবে বোধ হয়। মোটরের ধার ঘেঁষে একটু পথ রয়েছে, তাই দিয়ে গলে যাবে কিনা ঠিক করতে করতে দেখল বাড়ি থেকে অহীনের বৌ বেরিয়ে এসে মোটরের দরজা খুলে উঠল। তারক দেখল, বৌটির রঙ ফরসা, একটু মোটা। নিচু হয়ে ওঠার সময় ব্লাউজের নীচে চর্বির থাক পড়ল। দেখেই চোখ সরিয়ে নেয়। কেউ দেখলে কি ভাববে। অহীনের বৌ সুন্দরী, বি এ পাশ বলে শুনেছিল। তারকের মনে হল, সুন্দরীই। ডাক্তার স্বামী ভালই রোজগার করে। ক'বছরের মধ্যেই তো গাড়ি করল। অহীনকে বাড়িতে আনলে আট টাকা ভিজিট দিতে হয়। বিলেত যাবে নাকি এম আর সি পি পড়তে।

মোটরটা সাবধানে পিছু হটছে। তারকও এগোতে লাগল। তার দিকে মুখ করে পাঁচ গজ দূরেই অহীনের বৌ বসে। তারকের মনে হল তাকেই দেখছে। পাড়ারই একটা লোক, এই হিসাবেই নিশ্চয় দেখছে। সে যে অহীনের বাল্যবন্ধু, ম্যাট্রিক পর্যন্ত একই সঙ্গে পড়েছে, হাঁটতে হাঁটতে দুজনে প্রথম গড়ের মাঠ দেখতে যায়, মেয়েদের কোনখান দিয়ে ছেলে হয় তাই নিয়ে দুজনের একবার তুমুল তর্ক হয়েছিল, এইসব কথা ও জানে না। অহীনও নিশ্চয় বলেনি। বিয়েতে নেমন্তন্নই করেনি। কর্পোরেশন কাউনসিলার হবার জন্য ও নাকি দাঁড়াবে সামনেরবার। পাড়ার দুর্গাপুজোয় দু'বছর ধরে পৃষ্ঠপোষক রয়েছে।

গলিটা চওড়া হতেই গাড়িটা জোরে পিছু হটে বড় রাস্তায়

পড়ল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। অহীনের বৌ তখনো সামনের দিকেই তাকিয়ে বসে। তারক ওর ঘোমটা থুতনি এবং কপালের খানিকটা দেখতে পেল। [redacted] ট্রামরাস্তার উপর বড় ঘর ভাড়া নিয়ে ওষুধের দোকান করেছে। তার মধ্যেই খুপরীতে বসে রোগী দেখে। তারক ভাবল, এখন যদি কল আসে তাহলে ওকে রিক্সায় যেতে হবে। তবে বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জ থেকে কল আসবে না, অত বড় ডাক্তার এখনো হয়নি। ওর মত হাজার হাজার ডাক্তার কলকাতায় আছে। বড়জোর হাটখোলা, কুমোরটুলি নয়তো দর্জিপাড়ার লোকেই ডাকবে। পাড়ার লোক ছাড়া কে ওকে ভোট দেবে। পয়সা তো করেছে, চার আনার মিকশ্চার পাঁচ সিকেয় বিক্রি করে। এখন পয়সা ছড়িয়ে যদি ভোট পায়। ভোট চাইতে নিশ্চয় বাড়ি-বাড়ি যাবে। দেখা হলে আগের মত 'কিরে তারকা' বলে ঘনিষ্ঠতা দেখাবে। তখন পাত্তা না দিলেই হল।

গুটি পাঁচেক ট্রামে এবং বাসে ওঠার চেষ্টা করেও তারক পারল না। ন'টা পনেরোর পর থেকেই এই অবস্থা হয়। আজ দেরী হয়ে গেছে আট মিনিট। আর দেরী করা উচিত হবে না। এবারেরটায় উঠতেই হবে, এই ঠিক করে তারক তৈরী হয়ে দাঁড়াল। দু'টি স্ত্রীলোকও দাঁড়িয়ে অফিসে যাবার জন্য। ট্রাম আসতেই তারক দরজার হাতল ধরে একটা পা রাখার জায়গা কোনরকমে করে নিল। ট্রাম ছাড়ার পরমুহূর্তেই স্ত্রীলোক দুটির একজন মরীয়া হয়ে তারকের পায়ের উপর পা রেখে খাবলে ধরল ওর ডান হাতটা। খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েই তারক দেখল, পড়ে যাচ্ছে। বাঁ হাতে দ্রুত স্ত্রীলোকটির কোমর বেড় দিয়ে টেনে ধরল বুকের কাছে। এইভাবে প্রায় এক মিনিট থাকার পর তার মনে হল, হাতটা স্ত্রীলোকটির দেহের এমন জায়গায় বেড় দিয়ে রয়েছে যে, এখন তার বিরুদ্ধে

শ্লীলতাহানির চার্জ আনা যেতে পারে। তবু তার মনে হল পুরুষ মানুষের মত কাজই সে করছে।

ভাঙা লাইনের উপর ট্রামটা হোঁচট খেতে খেতে চলেছে। এক পায়ের উপর ভর দিয়ে, এক হাতে হাতল ধরে ও অন্য হাতে একটি দুর্ঘটনা রোধ করতে করতে তারক নিজেকে ঠিক পাঁচজনের একজন হিসাবে এখন ভাবতে পারছে না। অহীনের মোটরের সামনে হাঁটতে হাঁটতে তার যেরকম লাগছিল, এখন এতগুলো লোকের মাঝে একটি স্ত্রীলোকের কোমর ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে ঠিক তার বিপরীত অনুভবই হচ্ছে। এক সময় সে ট্রামের ভিতরের লোকদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল, "একটু এগিয়ে যান না দয়া করে, জায়গা তো রয়েছে। এইভাবে একজন মেয়েছেলে কতক্ষণ থাকতে পারে?"

এগোল না কেউই। কিন্তু তারক নিশ্চিন্ত হল তার কর্তব্যটুকু যথাযথ করে যেতে পারায়। কোমর ধরার জন্য নিশ্চয় মনে করছে না, লোকটা দুষ্টু চরিত্রের। তবুও উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল তারক। যদি পিঠটাকে বাঁকিয়ে হাতটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে বুঝতে হবে আপত্তি করছে। কিন্তু হাতটা তুলে নিতেও পারছে না, যদি পড়ে যায়! অবশেষে হাতটা সরিয়ে নেবার প্রথম সুযোগ আসতেই সে হাঁফ ছেড়ে পাশের লোককে বলল, "এইভাবে অফিস যাওয়া।"

স্ত্রীলোকটির মুখে কোন ভাবান্তর ঘটল না দেখে তারক দমে গেল। মনে হল, পাঁচজনের একজনের মতই যেন তার কথাটা বলা হল। আড়চোখে সে দেখল ব্রেশিয়ারের ফিতেটা ব্লাউজের গলা দিয়ে বেরিয়ে। ময়লা তেল চিটচিটে। কিন্তু মুখখানি পরিচ্ছন্ন। বয়স তিরিশের উপরই হবে। মনে হয় অম্বল আছে। তারকের আর মনে হল, পতন থেকে রক্ষার জন্য নিতম্বের পিছনে যে অবরোধ বাম উরু দ্বারা রচনা করেছে, সেটি এবার সরিয়ে নেওয়া উচিত। এরপর সে স্পর্শ বাঁচিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বাকি পথ দাঁড়িয়ে থাকল। কোন

ভাবেই স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাল না। শুধু একবার তার মনে হয়, ঘাড় ফিরিয়ে চাহনি দ্বারা তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত ছিল।

ট্রামটা লালদীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে থামবার আগেই তারক নেমে পড়ল। রাস্তা পার হবার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হল তাকে। ঘড়ি দেখল। একটা ছেড়া পোষ্টার চোখে পড়ল যেটা কালও আস্ত ছিল। 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই' পর্যন্ত রয়েছে। বাকিটা তার জানা—'এ লড়াইয়ে জিততে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল হিরণ্ময়ের দাঁড়াবার ভঙ্গিটা। যখন সে বলছিল, "আমরা মশাই মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। শ্লোগান দি, লাঠি খাই আর আন্দোলন করি" টেবলে বাঁ হাতের ভরে ঢ্যাঙ্গা ছিপছিপে শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে রেখেছিল। চুলগুলো কপালের উপর ঝুলে পড়ছে আর ডান হাতে তুলে দিচ্ছিল। ঠিক মনে হচ্ছিল ব্যাট ধরে উইকেটে দাঁড়িয়ে।

"কিন্তু আপনারা? কখনো লড়াইয়ে নামবেন না অথচ লড়াই করে পাওয়া সুযোগ-সুবিধার ফসল ঠিকই গোলাজাত করবেন।" চোখের শাদা অংশ ঝকমক করে উঠেছিল। চিবুকটা অহংকারে আর একটু এগিয়ে এসেছিল। যেন হ্যামণ্ডের মত কভার ড্রাইভ মেরে বোলারের দিকে তাকাচ্ছে।

রাস্তা পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারকের মনে হল, হিরণ্ময় হাতের মুঠো দিয়ে টেবলে আঘাত করে ফসল গোলজাত' কথাটা বলতে পেরে ভীষণ তৃপ্তি পেয়েছিল। হয়তো খুব অসাধারণ ভাবছিল নিজেকে। পাঁচজনের একজন। একটা পোস্টার দেখে আবার তার হিরণ্ময়কে মনে পড়ল। 'মহার্ঘ ভাতার সর্বভারতীয় ফর্মূলা চালু করতে হবে।" বাক্যটি হিরণ্ময়ের ঢ্যাঙ্গা শরীরটার মতই। ও যদি এখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় আর চীৎকার করে শ্লোগানটা বলে তাহলে ক'জন সাড়া দিয়ে বলবে, "করতে হবে করতে হবে।" একজনও না। কারণ অফিসের শ পাঁচেক লোক ছাড়া কেউ ওকে চেনে না।

এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সহ-সাধারণ সম্পাদক। তিন বছর চাকরিতে তিনশো চল্লিশ টাকা মাইনে। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে যখন-তখন ঢোকে, সাস্‌পেনশন রদ করতে পারে, ইনক্রিমেণ্ট-বন্ধ রোধ করতে পারে কিন্তু রাস্তায় ও রামা-শ্যামা।

এখন ডন ব্র্যাডম্যান যদি এখান দিয়ে হেঁটে যায়, তারক ভাবল, তাহলে কি হবে? ব্র্যাডম্যান যদি শ্লোগান দেয় "কণ্ডাকট রুল বাতিল কর।" কত লোক সাড়া দেবে? তারক মনে মনে হাসতে শুরু করল। "মূল্য বৃদ্ধি বোধ কর।" কে করবে, গভরমেণ্ট! তারকের হাসি বেড়েই চলল। ব্র্যাডম্যান যদি শ্লোগান দেয় তাহলে সে মিছিলে কত লোক সামিল হবে আর হিরণ্ময় দিলে কত লোক হবে?

"১৩ই সেপ্টেম্বরের পাওনা ছুটি" তারপরই 'তিসরি কসমের' পোস্টারে ওয়াহিদা রেহমানের বগল। বগলের নীচে কি আছে?—রোধ কর, বাতিল কর, দিতে হবে, চালু কর, চলবে না, করতে হবে? প্রত্যেকটা কথা বগলের নিচে বসিয়ে বসিয়ে মনে মনে গোটা শ্লোগানটা বারবার আউড়ে পরখ করে শুনতে শুনতে তারক অফিসে পৌঁছে গেল।

লিফটে বারোজন নেওয়া হয়। তারক লাইনে দাঁড়িয়ে এগোতে এগোতে পৌঁছে দেখল লিফটের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপরই হঠাৎ খুলে যেতে থাকল। লিফটম্যান এক গাল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

"চলে আসুন।"

লিফটের মধ্যে পা দেওয়া মাত্র তারক নিজেকে অন্য রকম বোধ করল। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাইরে লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলোর ব্যস্ত মুখ, ফ্যালফ্যালে চাউনি আড়াল পড়ে গেল। ঠাসাঠাসি হয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়ে তারকের মনে হচ্ছে,

লিফটম্যান নিয়ম ভঙ্গ করল তারই জন্য, এই বারোটা লোকের কারুর জন্য নয়। ভেবে সে পরম তৃপ্তি বোধ করল।

লিফটের উপরে ওঠা টের পাওয়া যায় না। শুধু শরীরটা শির শির করে, হাল্কা লাগে। লিফটের দরজার উপরে চৌকো আটটা সংখ্যার ঘর। সবাই সেইদিকে তাকিয়ে। এক এক তলায় এলেই সংখ্যার আলো জ্বলে উঠছে। কয়েকজন করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ওঠার সময় তারক বদলে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে ভুলে যায় সে বঙ্কুবিহারী সিংহের পুত্র, রেণুকার স্বামী, দুই ছেলের বাবা, কোনক্রমে আই এ পাশ এক নগণ্য কেরানী, একবার বাংলার রঞ্জি ট্রফি দলে দ্বাদশব্যক্তি হয়েছিল। শরীরের শিরশিরানিটা পাবার জন্য গত পাঁচ বছরে সে একদিনও অফিস কামাই করেনি। হরতালেও এসে বিদ্রূপ শুনেছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টান ছাড়িয়ে ওঠার কয়েক সেকেণ্ডের আনন্দ তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে। পৃথিবীর লোকগুলোক এই সময়টুকুর জন্য তার কাছে অকিঞ্চিৎকর লাগে। চোখ বুঁজে সে গোনে—দোতলা, তিনতলা এবার চারতলায় থামবে। তার মনে হয়, এখন ডালহৌসি পাড়ার রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে—ওই যে তারক সিন্‌হা বিরাট ক্রিকেটার, কতবার ভারতকে নিশ্চিত ইনিংস ডিফিট থেকে বাঁচিয়েছে। হিরণ্ময় নিশ্চয় বলবে, 'আপনি শ্লোগান দিলে সারা দেশ গলা মেলাবে।

"থার্ড ফ্লোর।"

লিফটম্যান তারককে উদ্দেশ করেই বলল। এই তলায় কেউ নামার নেই। কিন্তু ও জানে তারক স্টাফ সেকশানের লোক, তাই লিফট থামিয়েছে। অপ্রস্তুত হয়ে তারক বেরিয়ে এসেই ভাবল, লিফট-ম্যানের ছুটির দরখাস্ত বা মেডিকেল বিলের টাকা কি পড়ে আছে? থাকলে নিশ্চয়ই আজ আসবে তদ্বির করতে। এই ভেবেই তারক

আবার তৃপ্ত হল, এবং তখন সে নিজেকে বলল,—রোগটা জানা হয়েই গেছে যখন, ইঞ্জেকসান নিয়ে সরিয়ে ফেলব।

অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট ইন্দ্র ভট্টাচার্য—অনেকের ইন্দ্রদা কিন্তু তারক বলে বড়বাবু—চিন্তিত হয়ে বলল, "এগারোটা তো বেজে গেল, সলিল গুহ তাহলে আর আসছে না। বরং ওই যে নতুন ছেলেটি জয়েন করেছে—"

"না না", তারক থামিয়ে দিয়ে বলল, "নতুন-ফতুনের কর্ম নয়। এক ঘণ্টার কাজ চার ঘণ্টায় দাঁড়াবে তাহলে। আজকের দিনটা আমিই চালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আক্কেল দেখুন সলিলের, জানে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ হাতে, পনেরো তারিখের মধ্যে কমপ্লিট করতেই হবে। এখন কি কামাই করার সময়?"

"আমি কি বলব বল, ডি, জি. এমের লোক।" ইন্দ্র ভটচায হতাশ ভঙ্গিতে তালু উপুড় করল। তারক বিরক্ত হল এই ভঙ্গি দেখে। কিছুই যদি বলতে না পার তবে এই চেয়ারে বসা কেন!

"ডি, জি, এম-কে গিয়ে বলুন, পনেরো তারিখের মধ্যে এই পাঁচশো লোকের দশ মাসের মাইনের হিসেব এভাবে চললে থার্ড উইকের আগে হতে পারে না। এ কি সোজা ব্যাপার! প্রত্যেকটা লোকের সার্ভিস ফোলডার খুলে তাদের নাম, ডেজিগনেশন, ছুটির জন্য মাইনে কাটা যাওয়ার হিসেব ইনক্রিমেন্ট কষে তারপর দশ মাসের এরিয়ার পেমেন্টের হিসেব বার করা, দুজনে মিলে দিনে ছ-সাতটার বেশি হয় না। আর পনেরো তারিখের মধ্যে চাই বলে দিলেই হল। ওদের আর কি হুকুম দিয়েই খালাস। লোক বাড়াতে বললে তো বাড়াবে না, এদিকে রাসকেলটা ডুব মেরেছে। আপনি বরং জানিয়ে দিন।"

এই সময় ফোন বেজে উঠতেই ইন্দ্র ভটচায হাত তুলে তারককে চুপ করতে ইসারা করে ফোনে কথা শুরু করল। ওর ভঙ্গি দেখে

তারক বুঝল সুপারিনটেনডেন্টের ফোন। এই সময় সে দেখল, রতন দত্ত তাকিয়ে। চোখাচোখি হতেই মুচকি হেসে চোখ টিপল। তারক চোখ সরিয়ে ফোনে অপর দিক থেকে কি কথা বলছে বোঝবার জন্য ইন্দ্র ভটচাযের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে ঘাড়ের দাদটা দেখতে পেল। সেরে গেছে, কিন্তু বৃত্তাকার কালো দাগটা মিলোয় নি। প্রায়ই ওইখানটায় হাত বুলোতে দেখেছে তারক। ইন্দ্র ভটচাযের কাছ থেকে ফাইল এলে সে প্রথমেই গুহকে বলে খুলে দেখতে। ঘেন্না করে, সেটা কখনো জানায় নি। জানালেই গুহ বুঝে যাবে ব্যাপারটা। ছেলেটা বোকা নয়, ভাববে তারকদাটা স্বার্থপর।

"মিস্টার তেওয়ারী ডাকছেন। তুমি বরং চালিয়ে নাও আজকের দিনটা, আমি ওকে বলছি লোক দেবার জন্য।"

ইন্দ্র ভটচায উঠতে উঠতে বলল। তারক নিজের চেয়ারে ফিরে এল। গুহ সম্পর্ক তার রাগ এখন অনেক কম। দাদটা ছোঁয়াচে তো বটেই, যদি গুহর হয়? এই কথা ভাবতেই গুহর আঙুলগুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু ওখানেই যে হবে তার কোন মানে নেই। ঘাড়েও হতে পারে, যত লোকের দেখা যায় সবই তো ঘাড়ে। ফর্সা সলিল গুহর দাদ হলে খুবই ক্যাটক্যাট করবে। মুখচোরা ভালমানুষ ধরণের বটে, কিন্তু সাজগোজ চেহারার দিকে খুব যত্ন। মার্জিত গোটা গোটা উচ্চারণে কথা বলে—অরুনধুতি না বলে অরুন্ধতিই বলে। দাদ হলে নিশ্চয় ঘাড়ে মাফলার জড়িয়ে ঠাণ্ডা লাগার ভাণ করবে।

গুহর দাদ হলে দায়ী হব আমি, তারক যখন এইসব ভাবতে ভাবতে কাজ শুরুর উদ্যোগ করছে, রতন দত্ত এসে ফিসফিস করে বলল, "ইঁদুরটার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল?"

"কি আবার কথা হবে।"

"আহা বলোই না, তুমি তো খুব ডেঁটে বলছিলে মনে হল। ওভার টাইম ?"

ডেঁটে কথাটা শুনে তারক খানিকটা মজে গেল। বলল, "ওভার টাইম তো এই রোববারই করলেন, আবার চাই ?" তারক গলাটা সুপরিনটেনডেন্টের মত করার চেষ্টা করল। "আপনার বিলটা তেওয়ারী সাহেব চেয়েছেন।"

রতন দত্ত পাংশু হয়ে গেল।

"কেন কেন, ভুল হয়েছে কিছু ?"

"ফোনে ইন্দ্রদাকে বলছিল শুনলুম। কেন চাইল শুনতে পেলুম না। এমনিতেই ফাঁকি দেন, ওভার টাইমেও ত্থ ঘণ্টার কাজ ছ ঘণ্টায় করেন বোধ হয় তাই নিয়েই হবে।"

তারক প্রায়ই মজা করার জন্য রতন দত্তকে ভয় দেখায়। সেটা যখন বোঝে রেগে ওঠে।

"ফাঁকি আমি একাই দি ? তুমি কি দাও না ?"

"কবে দিয়েছি বলুন।"

"কবে আবার কি, রোজই দাও। যারা ফাঁকি দেয়, তেল দেয় তাদেরই উন্নতি হয়।"

"আমার কি উন্নতি হয়েছে ?"

"তোমার হয়নি" রতন দত্ত থতমত হল, কিন্তু দমল না। "অন্যদের তো হয়েছে। জান, ইঁত্থরটা আমার চার বছরের জুনিয়ার ? আমি তো বৌকে জি এম-এর বেডরুমে পাঠাতে পারিনি তাই কেরাণী হয়েই রইলুম আর ও অফিসার গ্রেডে উঠে গেল। সুপারিসড করে প্রমোশন! কই ইউনিয়নের বাবুরা এই নিয়ে তো লড়লো না।

পিছনের টেবল থেকে গোরা মিত্তির বলল, "আপনি তো নন-ম্যাট্রিক, ইন্দ্র ভটচায বি কম। ইউনিয়ন লড়বে কোন গ্রাউণ্ডে

বলুন। শুধু সিনিয়ারিটিতেই তো হয় না, কোয়ালিফিকেশন বলেও একটা ব্যাপার আছে।"

"হ্যাঁগো হ্যাঁ জানা আছে, কত তো কোয়ালিফিকেশনগুলা সব। আমার বেলাতেই যতো আইন আর রুলস। তারকই বলুক, ফলস্ মেডিকেল বিল দিয়ে যারা ধরা পড়ল, তিন বছরের ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ হল ইউনিয়ন তাদের হয়ে লড়েনি ? তারা ইউনিয়নের লীডার তাই এর বেলায় দরদ উথলে উঠল। বল না তারক, চুপ করে আছো কেন।"

রতন দত্ত সপ্তাহে অন্তত একবার এইভাবে সকলকে শুনিয়ে গালিগালাজ করবে। কেউ বিশেষ কান দেয় না যদি না রসালো কেচ্ছার গন্ধ থাকে। তারকের মায়া হয় এই লোকটিকে পাগলের মত আচরণ করতে দেখলে। শুনেছে ওর স্ত্রীর মাথা খারাপ। বছর পনেরো আগে বড়ছেলেটি পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। মেজ ছেলে স্কুল ফাইনাল পাশ করে জার্মাণী গিয়ে আর ফেরেনি।

"রতনদা এবার চুপ করুন।" তারক অনুরোধ করল।

"হ্যাঁ চুপই করব, কি হবে এসব কথা বলে, আমার তো রিটায়ার করার সময় এসে গেল।"

রতন দত্ত নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। তারক টানা তিনঘণ্টা কাজ করে, চোখ টনটন শুরু হতেই টিফিন করার জন্য দোতলার ক্যান্টিনে নেমে এল।

ঘরটা লম্বা, দু পাশে টানা বেঞ্চের মত টেবল আর স্টীলের চেয়ার, প্রায় ষাটজন বসতে পারে। ঘরটা অর্ধেক ভরা। দরজার পাশেই কুপন কাউণ্টার, মেঝেয় দাঁড় করান একটা ব্ল্যাকবোর্ড। খড়ি দিয়ে খাবারের নাম ও দাম লেখা। তারক পড়তে শুরু করেছে, ক্যান্টিন ম্যানেজার পা নাচাতে নাচাতে বলল, "আজ মাংস হয়েছে খেয়ে দেখুন, ছ' আনা প্লেট।"

"শুধু তো হাড় আর চামড়া।"

"কি যে বলেন, তিন পীস মাংস, দুটো আলুর টুকরো। কে পারবে দিতে! আলু এক টাকা, মাংস ছ' টাকা কিলো। বাড়ীতেও এর থেকে বেশি পাবেন না।" বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা কুপন ছিঁড়ে তারকের দিকে তাকিয়ে বলল, "রুটি নেবেন তো?"

যেন ধরেই নিয়েছে এরপর আর কোন বিচার-বিবেচনা চলতে পারে না। তারক তাকে অগ্রাহ্য করবে না।

"না, মাংস খাব না, শুধু চা আর টোস্ট।"

"সেকি খাবেন না!" আহত ভঙ্গিতে ম্যানেজার তারকের দিকে তাকিয়ে থাকল, "আমি যে কুপন কেটে ফেললুম!"

"আর কাউকে বিক্রি করে দেবেন।" তারক যতটা পারা যায় অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করল অন্যদিকে তাকিয়ে পকেট থেকে পয়সা বার করতে করতে হ্যাঁ বা না-র তোয়াক্কা না করে কেন কুপন কাটল। আমায় ভেবেছে কি! ওর ইচ্ছে অনুযায়ী খেতে হবে নাকি! তোয়াক্কা শব্দটা তারকের মাথায় কয়েকবার ছোটাছুটি করে গেল।

খাবারের কাউন্টার থেকে চায়ের কাপ আর টোস্ট হাতে তারক ঘুরে দাঁড়াতেই পদ্মনাথবাবু চেঁচিয়ে ডাকল, "এই যে আসুন এখানে।"

বসামাত্র তারককে জিজ্ঞাসা করল, "পনেরো তারিখের মধ্যে পাচ্ছি তো?"

"হয়তো দেরী হবে একটু।"

"না দাদা, দেরীটেরী বললে শুনব না। তাহলে লাইফ ইনসিওর করে ওইদিন আসবেন।"

তারক মুচকি হেসে উপভোগ করল পদ্মনাথের উৎকণ্ঠা। লোকটার কত মাইনে সে জানে। থোক একশো দশ টাকার মত পাবে, তার জন্য রোজ একবার করে খোঁজ নেবেই। অথচ

লিফটম্যানটার পাওনা হয়েছে প্রায় সাড়ে চারশো টাকা। সেদিন একথা জানাতেই মাথা চাপড়ে বলেছিল, 'চলুন মশাই গিয়ে ম্যানেজ-মেণ্টকে বলি, আমাদের দপ্তরী, পিওন করে দিন। আমাদের বাড়বে মাসে দশবারো টাকা আর ওদের পঞ্চাশ টাকা!'

একটু দূরেই কি একটা নিয়ে তর্কাতর্কি হচ্ছে। হঠাৎ জোর গলায় এক ছোকরা বলে উঠল, "সুইমিং কস্টুম পরেছিল তো কি হয়েছে? দেখুন গিয়ে কলকাতার হাজার হাজার বাড়ীতে মেয়েরা সায়া-ব্লাউজ পরে না, বুক খুলে গঙ্গায় চান করে।"

"শুধু বুড়িরাই করে।"

"বেশ তাই-ই করে। সেটা কি দেখতে খারাপ লাগে না? বুড়ি বলে নয় ধরা গেল তার সেক্স নেই কিন্তু কথাটা হচ্ছে ভাল লাগা বা কুচ্ছিত লাগা নিয়ে রুচি, নিয়ে, তাই তো?"

"অতশত বুঝি না বাপু, তবে ইণ্ডিয়ানদের চোখে এসব ভাল লাগে না। এসব বিলেতের মেয়েরা করলে কিছু বলার নেই। পাত্রপক্ষ যদি তোমার বোনকে দেখতে এসে বলে নেংটি পরো, সৌন্দর্য আছে কিনা দেখব, তখন তুমি কি বোনকে কস্টুম পরাবে?"

"পার্সোনাল টাচ দিয়ে কথা বলবেন না বোসদা, যা নিয়ে কথা হচ্ছে তাই নিয়ে বলুন।"

"কেন বলব না? নিশ্চয় বলব, একশোবার বলব। ইণ্ডিয়ান মেয়ে মাত্রেই তোমার বোন। রিতা ফারিয়াও তোমার বোন। সে পরাতে যদি আপত্তি না করো তাহলে নিজের বোনের বেলাতেও আপত্তি করবে না, বলো করবে?"

বোসদা নামক টাক মাথার লোকটি চেয়ার ছেড়ে টেবলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পাশের লোকেরা মিটমিট করে হাসছে। তারক দেখল ছোকরার মুখ লাল, নিরুপায়ের মত এধার ওধার তাকাচ্ছে।

"না করবো না।" টেবলে চাপড় মেরে ছোকরা চীৎকার করে উঠল, "করবো না।"

অনেকগুলো চীৎকার ফেটে পড়ল এক সঙ্গে। ছোকরা উঠে চলে গেল। পদ্মনাথবাবু চাপা স্বরে বলল, "কি রকম বুঝছেন দিনকাল ?"

তারক হেসে চুপ রইল।

"আমাদের জীবদ্দশায় মেয়ে দেখার এই সিস্টেমটা যদি চালু হয় তাহলে আবার বিয়েয় বসে যাব মশাই।"

হ্যা হ্যা করে হাসতে থাকল পদ্মনাথবাবু। তাবক পায়োরিয়ার গন্ধে মুখ ঘুরিয়ে নিতেই দেখল হিরন্ময় ঢুকছে, সঙ্গে ব্রাঞ্চ সেকশনের বিমল মান্না। হিরন্ময় ঘাড় নেড়ে মান্নাব কথা অনুমোদন করতে করতে তাকিয়ে দেখে নিল ঘরের লোকেদের। তারককে দেখে এগিয়ে এসে সামনের চেয়ারে বসল।

"কাল ময়দানে রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির সভায় যাচ্ছেন তো ?"

তারকের মনে হল, যেন হাল্কা বিদ্রুপ রয়েছে সুবে।

"তাই নাকি।" বলেই সে ভাবল, এতে হিরন্ময় কি বুঝতে পারবে ওকে তোয়াক্কা করি না।

"কাল আমরা ছুটির পর গেটের সামনে জমায়েত হচ্ছি। যদি পারেন তো আসুন। পদ্মবাবু সার্কুলারগুলো আজই কিন্তু আপনার ডিপার্টমেন্ট বিলি করে দেবেন, অন্তত তিনশো লোকের মিছিল এবার করতেই হবে।"

পদ্মনাথবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল. যেন এখুনি বিলি করতে যাচ্ছে। একা মুখোমুখি হিরন্ময়ের সঙ্গে বসে থাকতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল তারক। বয়সে অন্তত সাত-আট বছরের ছোট কিন্তু চালটা এমনভারিক্কি আর ব্যস্ত, তারকের অস্বস্তি হয় ওকে দেখলেই। ওর কথাবার্তার

মধ্যে এমন বহু শব্দ থাকে, মনে হয় শ্লোগান থেকে খুঁটে নেওয়া, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন, অভ্যেসে বলে যায়। বক্তৃতার সুর ওর কথাতেও এসে গেছে। ফলে মনে হয়, উপদেশ আর নির্দেশ দিচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ফলে জানুয়ারী থেকে মাইনে বেড়েছে, হিরন্ময়কে দেখে মনে হয় যেন একমাত্র ওর জন্যই সম্ভব হল। জি এম পর্যন্ত ওকে খাতির করে। ক্ষমতাও আছে, নয়তো মিথ্যে মেডিকেল বিল দেওয়ার ব্যাপারে বিমল মান্নার তো চাকরি যাওয়ারই কথা।

"আচ্ছা তারকবাবু" বোসদাকে ঘিরে বসা জটলা থেকে একটি ছেলে উঠে এল। "গ্যারি সোবার্সের মত অল রাউণ্ডার কখনো জন্মেছে কোনকালে ?"

তারক ছেলেটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "হঠাৎ আমাকে এ প্রশ্ন কেন ?"

ছেলেটি অপ্রতিভ হয়ে গেল। "আপনিতো খেলতেন টেলতেন, বেঙ্গল টিমেও এসেছিলেন, আপনার মতামতের মূল্য নিশ্চয় আছে। আমাদের থেকে নিশ্চয়ই বেশি বোঝেন। বোসদা বলছে কিথ মিলার নাকি সোবার্সের থেকেও বড়! উনি নাকি মিলারের খেলাও দেখেছেন !' ৬

তারকের প্রথমেই মনে হল, ছেলেটি বাজে তর্ক করে সময় কাটাবার জন্য তাকে হাতিয়ার করতে চায়। তার বদলে, মতামতের মূল্য আছে-টাছে বলে খানিকটা দাম আগাম চুকিয়ে দিল। তারপর তারকের মনে হল, হয়তো কাউকে পরে জিজ্ঞাসা করবে, টি সিনহার স্কোর কত ছিল ? কোন বছর খেলেছিল ?

"বলতে পারব না, আমি কারুর খেলাই দেখিনি।"

ছেলেটির চোখে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ল। "সেকি, হতেই পারে না।"

"বললুম তো।" তারকের গলা কঠিন শোনাল।

"আপনি সোবার্সের খেলাও দেখেননি !"

জবাব না দিয়ে তারক মুখ ফিরিয়ে রইল। ছেলেটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। তারক লক্ষ্য করল হিরন্ময়ের চোখে কৌতূহল, কিছু একটা বলবে।

"আপনি এখন আর খেলেন না ?" হিরন্ময় দেশলাই কাঠি বার করল কান চুলকোবার জন্য। তারক প্রথমে ভাবল, জবাব দেবে না। তাই না শোনার ভান করে রইল।

"আপনি কতদিন খেলা ছেড়ে দিয়েছেন ?"

তারক এবার তাকাতে বাধ্য হল। হঠাৎ তাঁর মনে হল নারানের ইন্টারভিউ পাওয়ার ব্যবস্থা তো একে দিয়েই করান যায়। ইনক্রিমেণ্ট বন্ধের শাস্তিও যখন মকুব করিয়ে দিতে পারে।

"দশ বারো বছর মাঠে যাই না।"

তারক সতর্ক হয়ে বলল যেন বেশি দূরে কথা না গড়ায়। অবশ্য খেলার দিকে হিরন্ময়ের ঝোঁক আছে বলে মনে হয় না। নারানের জন্য কিছু একটা উপায় করতে হবে ওকে দিয়ে।

"যান না কেন ?"

"ভাল লাগে না।"

তারক ভাবল, এত ছোট উত্তর শুনে হিরন্ময় খুশি হবে না। ধারণাটা যাতে ভাল হয় সেই রকম কিছু বলা উচিত।

"চাকরি আর সংসারের ঝামেলার মধ্যে থেকে খেলা সম্ভব নয়। অফিস তো আর খেলার জন্য মাইনে দেবে না।"

"ছুটির দিন তো খেলতে পারেন। হিরন্ময় সহানুভূতি দেখাল। তারক ভাবল একে বোঝান যাবে না খেলাটা তার কাছে সখের ব্যাপার নয়। তাছাড়া খেলা নিয়ে কথা বলতেই এখন ক্লান্তি আসে। "একবার যা ছেড়ে দিয়েছি, তা আর ফিরে ধরা সম্ভব

নয়। এখন মনে হয় খেলার সময়টুকুতে দু পয়সা রোজগারের চেষ্টা করলে লাভ হবে। খেলে তো দেখেছি, কি হয় ?"

তারককে কয়েক মুহূর্তের জন্য কাতর দেখাল। হিরণ্ময় দেশলাই কাঠিটা বাক্সে ভরে রেখে বলল, "শুধু আপনি একা নন। লক্ষ লক্ষ লোক আজ আপনার মতই হতাশ হয়ে পড়েছে। বাঁচবার জন্য, দুটো পয়সা রোজগারের জন্য মানুষ তার আনন্দগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছে।"

ঘোড়ার ডিম করছে। তারক বিরক্ত হয়ে ভাবল খালি বাঁধা বুলি আওড়ান। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ফেলতে না পারলে যেন ওর কথা বলাই হয় না। ওই তো বোসদা দিব্যি আনন্দ করছে। কি বাতিল করার আছে ওর ! ও আর আমি হিরণ্ময়ের কাছে লক্ষ লক্ষ লোকেরই দুজন। দুটো সংখ্যা। লক্ষ লক্ষ থেকে আমি বাদ পড়লে কেউ টেরও পাবে না। কিন্তু বাদ না দেওয়াতেই হিরণ্ময়ের আনন্দ।

"কাল থাকছেন তো।"

"নিশ্চয়।"

তারক ভাবল, এখনি যদি নারানের কথাটা বলি তাহলে বোকার মত কাজ হবে। লক্ষ লক্ষের একজন ধরে নিয়ে আমার প্রতি যে করুণাটা ওর মধ্যে তৈরী হচ্ছে ভেঙ্গে যাবে। একদিন মিছিলে চীৎকার করলে যদি কাজটা করে দেয়, তাহলে নারানের জন্য চীৎকার করতে আপত্তি নেই।

তারক ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল।

"চললেন ?"

হিরণ্ময় নিছক পোশাকী গলায় বললনা। 'গোলাজাত' বা 'বাতিল' ধরণেরশব্দগুলো যেরকম ধাতব, কঠিন করে বলে, সে তুলনায় খুবই বাস্তব এবং আটপৌরে। তারকের মনে হল ওকে পটান যাবে।

তাক্ বুঝে বললে নিশ্চয় চেষ্টা করবে। তবে লক্ষ লক্ষ লোকের একজন হতে পারলে আরো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

তারক ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে পেচ্ছাপখানায় গেল এবং ইঞ্জেকসান নেবার কথা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এল। অথচ প্যাণ্টের বোতাম খোলার সময়ও লক্ষ লক্ষ লোকের একজন হওয়ার চিন্তাই মগজে ছিল। জ্বালা করে উঠতেই লক্ষ লক্ষ লোক, কয়েক লক্ষের পেনিসিলিন হয়ে গেল। সাতদিনের একটা কোর্স নিলেই ভাল হয়ে যাব এবং আজ থেকেই নেওয়া শুরু করতে হবে, এই কথাটা মনে মনে আবার ঝালিয়ে নিয়ে সে কাজে বসল।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই সে বুঝে গেল কাজ এগোচ্ছে না। যত সহজ ভেবেছিল ইঞ্জেকসান নিয়ে সারিয়ে ফেলবে, এখন মনে হচ্ছে মোটেই তত সোজা নয়। কোথায় কার কাছ থেকে নেবে? কি হয়েছে, কেন হল, কোত্থেকে হল এন্তার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে! তাহলে অহীনকেই তো বলা যায়। অহীন অবাক হবার ভাণ করে মনে মনে নিশ্চয়ই হাসবে। লোপ্পাই ক্যাচ ফেলে বালক সঙ্ঘের সঙ্গে জেতা ম্যাচটা হারিয়ে দিতে টেনে চড় কষিয়েছিলুম। হয়তো এখনো ভোলেনি। বৌকে গল্প করতে করতে নিশ্চয় বলবে—আমাদের পাড়াবই, এক সঙ্গে ছোটবেলায় কত খেলেছি। রোজ তো আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই অফিস যায়। দেখলেই চিনতে পারবে। প্রায়ই খয়েরি একটা টেরিলিন প্যাণ্ট আর হাওয়াই সার্ট পরে, বাঁ দিকের কাঁধটা উঁচু করে হাঁটে, বেঁটে, ফরসা, আর পাঁচটা লোকের মতই দেখতে। খেলতো ভালই, একবার বেঙ্গল টিমে টুয়েলফথম্যান হয়েছিল। ওর যে এমন অধঃপতন হবে ভাবতেই পারা যায় না।

বৌটা নিশ্চয়ই বলবে, টুয়েলফথম্যান আবার কি গা? অহীন বোঝাবার জন্য বলবে—থপথপে অহীন, স্টান্স নিয়ে ব্যাটের হ্যাণ্ডেলটা তলপেটে চেপে, পোঁদটা ডেঁয়ো পিঁপড়ের মত তুলে যেন হুমড়ি

খেয়ে পড়ত, চোখ বুঁজে ফরোয়ার্ড খেলত, সেদিন পর্যন্তও জানত না মেয়েদের কোথা থেকে ছেলে বেরোয়, সেই আহম্মকটা বৌকে বোঝাবে টুয়েলফথম্যান কাকে বলে !

তারক হিজিবিজি কাটছিল কাগজে। একদৃষ্টে কাগজটার দিকে তাকিয়ে কতক্ষণ বসেছিল খেয়াল নেই, সামনে একজন এসে দাঁড়াতেই চমকে মুখ তুলল।

"ওহ, নারাণ এসেছ, বোস।"

ব্যস্ত হয়ে তারক কাগজটা দলা পাকিয়ে ঝুড়িতে ফেলল।

"এমন দেরী করে বললে, ইন্টারভিউয়ের লিস্টতো তৈরী হয়ে গেছে। এ জি এমের কাছে বোধ হয় কালই পাঠান হবে।" নারাণের চোখে ঝকঝকে রঙটার ম্লান হওয়া লক্ষ্য করল তারক। তাইতে দুঃখ পেয়ে সে ভাবল, সবে বাইশ বছর বয়স মাত্র। কেন যে কেরাণী হতে চায়!

'তবে এখনো হাতছাড়া হয়নি। একজনকে বলেছি, সে পারে নাম ঢুকিয়ে দিতে। অ্যাপ্লিকেশান কবে এন্ট্রি করা হয়েছে, এ জি এম সেটা নাও চেক্ করতে পারে। তবে কি জান, জোর করে তো বলতেও পারা যায় না, ইংরিজিতে এত কম নম্বর পেয়েছ।"

নারাণ মাথা নামিয়ে আঙুল দিয়ে টেবলের উপর কিছু একটা মকস করা শুরু করল। তারক বুঝতে পারল না সেটা বাংলা চার কি পদ্ম ফুলের পাপড়ি।

"তোমাদের বাড়িতে তো সবাই ভাল ইংরিজি জানে, তবে তুমি এত কাঁচা হলে কি করে?" তারক ভৎসনার সঙ্গে অনুযোগও মিশিয়ে দিল, যাতে স্নেহের সুরটা কানে প্রথমেই বাজে।

"বাবা মারা যাবার পর কি হল জানেনই তো।" নারাণ নিচু স্বরে চোখে চোখ না রেখে যেভাবে বলল তাতে তারক আবার কষ্ট পেল। এই বয়সে এমন স্বরে কেন কথা বলে!

"বড়দা বছরে দু' একবার মাত্র উঁকি দিয়ে যায়। শুনেছি শ্বশুর মারা যাওয়ায় তিন কাঠা জমি পেয়েছে টালিগঞ্জে, সেখানেই বাড়ি করবে। মেজদা তো আর ফিরলই না। আমার এক বন্ধুর দাদা প্যারিস থেকে ফিরেছে, তার কাছে শুনলুম, বিয়ে করেছে মেজদা। রাঙাদা গত বছর ডি ফিল পেল, চেষ্টা করছে আমেরিকা যাবার। আমার লেখাপড়ার দিকে কেই বা নজর দেবে বলুন।"

নারাণের গলায় ক্ষোভ ফুটে উঠলেও তারকের মনে হল দাদাদের নিয়ে যেন ঈষৎ গর্বিত। তারক অন্য কিছু মনে করল না। বনেদী ঘরের ছেলে, ওর বাবা গগন বসুমল্লিক চাকরী না করেই সারাজীবন কাটিয়ে গেছে। কলকাতার বুকে সাত বিঘের উপর জমি আর বসত বাড়ি। এক এক কাঠার দামই তো কম করে পনেরো হাজার টাকা।

"তোমার কাকারা এখন, গেট দিয়ে ঢুকেই ডানদিকের কাঁটালি চাঁপা গাছটার দিকে যে অংশ ওখানেই থাকেন, না?"

"ওরা এখন সামনের দিকে থাকে। পার্টিশান হবার পর ওরা তো প্রায় গোটা বাড়িই পেয়েছে, জমিও। আমরা পেছন দিকে থাকি।"

তারক শুনেছিল শেয়ারবাজারে টাকা খাটাতে গিয়ে গগন বসুমল্লিকের দেনা হয়। ভাইয়েদের কাছে সম্পত্তির অংশ বিক্রি করে দেন। বিক্রি না করলে শুধু জমি বাবদই এখন কত টাকা নারাণের ভাগে থাকত তার একটা হিসেব তারক মনে মনে কসে ফেলল। কাকাদের এবং তিনদাদার অংশ বাদ দিলে প্রায় এক লাখ পনেরো হাজার টাকা। তারকের চোখে আক্ষেপ ফুটে উঠল। এতগুলো টাকা যদি নারাণের আজ থাকত! গগন বসুমল্লিকের একটা ভুলের জন্য তার ছেলেরা গরীব হয়ে গেল। এমন ভুল বঙ্কুবিহারী কখনোই করত না। অবশ্য অত টাকাই বা কোথায় যে শেয়ার বাজারে নামবে। হাজার পনেরো টাকার চার-পারসেন্ট

সুদের ডিবেঞ্চার কেনা পর্যন্তই তো দৌড়। আর ঝি-চাকর-গয়লাদের শতকরা বায়াত্তর টাকা সুদে পঁচিশ-পঞ্চাশ করে ধার দেওয়া। তারক ভাবল, তবু তো একটা বাড়ি, পনেরো হাজার টাকা আর ছুটো ভাড়াটে তার জন্য বঙ্কুবিহারী রেখে যাবে।

"আর কোথাও চেষ্টা করছ?"

"না, তবে শর্টহ্যাণ্ড শিখছি!"

"ওতে কিছু হবে না, ব্যবসায় চেষ্টা করনা কেন?"

"টাকা কোথায়!"

"টাকা না হলে কি ব্যবসা হয় না। গুজরাটি, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, মাড়োয়ারীরা কি টাকা নিয়ে এদেশে আসে? আসলে পরিশ্রমটাই হচ্ছে মূলধন। বাঙালী জাতটাই এত বাবু হয়ে গেছে না, নইলে কলকাতার বুকে বসে অবাঙালীরা বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রী করে লাল হয়ে গেল আর আমরা কিনা তাদের গোলামী করি!"

তারক হঠাৎ থেমে গেল। তার মনে হল সে যেন হিরন্ময়ের গলা নকল করছে। অবশ্য হিরন্ময়, বাঙালী-অবাঙালী বলে না। শোষকশ্রেণী আর জনগণ, মানুষ ওর কাছে ছুভাগে বিভক্ত এবং খুব দ্রুত মানুষকে সে ভাগ করে ফেলতে পারে। তারকের ঈষৎ ইচ্ছা হল, নারাণকে শোষক শ্রেণীভুক্ত হওয়ার দিকে উত্তেজিত করে তুলতে।

কিন্তু নারাণের বিষণ্ণ মুখে, ব্যবসা করে বড়লোক হবার কোন ইচ্ছা ফোটেনি দেখে তারক অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য বলল, "তোমাদের গেটের পাশেই একটা পামগাছ ছিল, আছে এখনো? অনেকদিন তোমাদের বাড়ির দিকে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।"

"আছে, তবে পাতাটাতা আর নেই। গাছটা মরে যাচ্ছে। বয়স তো কম হল না।"

"কত ?"

"তা ধরুন, বাড়ির বয়স প্রায় একশো তিরিশ-পঁয়ত্রিশ তখনকারই গাছ।"

"গাছটার পাশেই ইলেকট্রিক মিটারের ঘর। ওর দরজাটা ছিল টিনের। বল লাগলেই আওয়াজ হত। আর তখন তোমার সেজোকাকার চীৎকার শুনতে হত। খুব খিটখিটে ছিল। তবে তোমার বাবা কিছু বলতেন না। প্রায়ই দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখতেন। রাশভারি লোক। তুমি তো দেখনি কি মেজাজ ছিল। তোমাদের পাড়ার সার্বজনীন দুর্গাপুজো তো উনিই আরম্ভ করেন। প্রথমবার একাই সব খরচ দেন।"

"স্কুলে দেখেছি একটা পাথরে বাবার নাম লেখা আছে। কুড়ি হাজার টাকা ডোনেট করেছিলেন।"

"আমরা একবার ব্যাট-বল কেনার পয়সা চাইতে তোমাদের দোতলায় গেছলুম, ওঁর কাছে। গোপাল, তোমার মেজদা, আমাদের সঙ্গেই খেলত। সে তো দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই হাওয়া। কেউ আর সাহস করে ঢোকেই না। এ ওকে ঠেলে, সে তাকে ঠেলে। এমন সময় ভেতর থেকে গম্ভীর গলায় 'কি চাই', শোনামাত্র সবাই হুড়হুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাল। কিন্তু আমি রয়ে গেলুম। তারপর ভেতরে ডাকলেন। কোন রকমে তো চোখ বুঁজে বলে ফেললুম। সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকার একটা নোট বের করে দিলেন।"

তারক দেখল নারাণ হাসবার চেষ্টা করে মুখখানা বুড়োটে করে ফেলেছে। কিন্তু তার নিজের মধ্যে একটা টগবগে ইচ্ছা ফেঁপে ওঠার উপক্রম করছে। এখন এন্তার কথা বলে যেতে পারে। ষোল-সতেরো বছর বয়সটা যেন অতীত থেকে তীব্রবেগে ধেয়ে এসে, তার শরীর ফুঁড়ে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

"আপনি তো আগে আমাদের বাড়ি খুব যেতেন। মা বলছিলেন, অনেকদিন আসেন না।"

"যাব আসলে সময়ই পাই না। গোপালটাও বিদেশ চলে গেল, খুব বন্ধু ছিল আমার, বলতে গেলে একমাত্র বন্ধু। ও না থাকলে আমার খেলা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত, রঞ্জিট্রফি পর্যন্ত আর হত না। তাছাড়া—" তারক থেমে কি যেন ভাবতে গিয়ে চোখটা নারাণের থেকে সরাতেই দেখল সুপারিনটেনডেনট তেওয়ারী ঘর থেকে বেরিয়ে রেফাবেন্স সেকশনের দিকে যাচ্ছে। তারক হঠাৎ ভীত বোধ করল এবং [illegible] ওঠার চেষ্টায় হুম্ করে বেপরোয়ার বলল, "তোমার দিদিতো এখন বরানগর থাকে, তাই না ?"

"পাইকপাড়ায়, জামাইবাবু আজ বছর চারেক হল বাড়ি করেছেন। পারচেজিং অফিসারের কাজ করেনতো।" নারাণ চতুর চতুর মুখভঙ্গি করে বোঝাতে চাইল বাড়ি করার রহস্যটা। তাই দেখে তারক মনে মনে বলল, জানি জানি, বাড়িটাও একবার দেখে এসেছি লুকিয়ে। চুরির পয়সায় মন্দবাড়ি হাঁকায়নি ! বৌকে সুখেই রেখেছে বলে মনে হয়। তোমার দিদির ভাগ্য ভালই।

"ওকে ধরেও তো কোথাও ঢুকে পড়তে পার।"

"লজ্জা করে। কুটুমের কাছে এসব ব্যাপার নিয়ে বলতে যাওয়া কি ঠিক হবে।"

"তা বটে।"

তারক খুশি হল। নারাণকে এখন তার খুব আপনজন লাগছে। হিরন্ময়কে দিয়ে যেভাবে হোক ওর ইণ্টারভিউয়ের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তারপর ভাগ্যে থাকলে হবে।

নারাণ চলে যাবার পর তারক কাজে মন বসাতে গিয়ে পামগাছটাকে বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখল। 'সবাই হুড়হুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাল। কিন্তু আমি রয়ে গেলুম।'

কথাটা কি পুরো সত্যি ? তারকের মনে হল, এই শুনে নারাণ নিশ্চয় তাকে খুব সাহসী ভাবল।

তখন নারাণ জন্মায়নি। দোতলার বৈঠকখানায় দেয়াল জোড়া মস্ত আয়নায় ঘরের আধখানা, দরজার কাছ থেকে দেখা যাচ্ছিল। গৌরীর পিঠটাই শুধু দেখেছিলুম। টেবলে ঝুঁকে কি যেন লিখছে। 'কি চাই' শুনে চট করে মুখ ফিরিয়ে গৌরী দরজার দিকে তাকাল। কিছু দেখতে না পেয়ে তখন আয়নার মধ্য দিয়ে দরজার বাইরে আমাকে দেখেই অবাক হয়ে গেল। দূর থেকে ওকে অনেকবার দেখেছি, যখন স্কুলে যেত বা জানালায় কি [illegible] এসে দাঁড়াত। এই প্রথম এত কাছ থেকে দেখলুম, খৈ-এর মত গায়ের রঙ, কুচকুচে ভ্রু, [illegible] বাঁধা, ফ্রকের রঙটা ছিল হালকা গোলাপী। চোখটা আপনা থেকেই ওর বুকের উপর রাখলুম। তখন অসভ্য ব্যাপারগুলো সবে শিখেছি। গৌরী আমার থেকে বছর দুয়েকের ছোট। মনে মনে বহুবার ওকে চুমু খেয়েছি বা উত্তেজনা তৈরীর কাজে ওকে ব্যবহার করেছি।

সেই গৌরী যখন আমার দিকে তাকিয়েছিল, খুব লজ্জা করল, ঘরের কোনের দিকে তাকিয়ে কি যেন সে বলল। আয়নার ওইদিকটা দেখতে পাচ্ছিলুম না। কি একটা জবাব পেল। তখন উঠে দরজার দিকে আসতে লাগল। আয়নায় দেখছি ও এগোচ্ছে। তখন মনে হল এবার পালিয়ে যাই। হঠাৎ আয়নার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল যেন। একদম সামনে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। ঘাড়টাকে বাঁ দিকে হেলিয়ে (কানের রিংটার সঙ্গে লাগান ঝুমকোগুলো তখন কেঁপে উঠেছিল) হাসল, গালের উপর দিয়ে আলতো করে যেন জল সরে যাচ্ছিল, হেসে বলল—

"সিনহা, এটা ভাই একটু মিলিয়ে দেখে দাও তো।"

পাশেব টেবল থেকে লাইনবন্দী অঙ্কে ভরা একটা পাতা এগিয়ে এল। তারক একটানা পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে গেল।

॥ তিন ॥

বাসটা আসছে। ডান দিকে হেলে পড়েছে। রাইটার্স বিল্ডিংসের ফুটপাথ ঘেঁষে মোড় ঘুরল। টায়ারের সঙ্গে মাডগার্ড ঘষার কিচকিচ শব্দে আউরে উঠল তারক। বাসের জানালাগুলো দিয়ে জমাট বাঁধা একসার বিষণ্ণ বিরক্ত মুখের মানুষ ক সে চলে যেতে দেখল। তারক ভাবল, এইভাবে আমি দক্ষিণেশ্বরে যাব কি করে।

দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। চেনা কাউকে পেলে গল্প করবে। এধার ওধার তাকাল। একজনকে দেখে মনে হল বোধ হয় সকালের সেই স্ত্রীলোকটি যাকে সে ট্রাম থেকে পড়ে যেতে দেয়নি। চুলে একটা গন্ধ পেয়েছিল। বুকের কাছে মাথাটা ঠেকে ছিল আলতো। নিঃশ্বাস চেপে কেঁপে উঠেছিল একবার।

তারক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মনে করতে চেষ্টা করল। হাতটা রেখেছিল পিঠ আর বাহুর জোড়ে। ওর দেহের কিছু কিছু অংশ তার দেহের সঙ্গে ছুঁয়ে ছিল। একটা গন্ধ পাচ্ছিল চুল থেকে। মাথাটা বুকে আলতো ভাবে ঠেকছিল। গৌরী অবশ্য এর থেকে আর একটু জোরেই চেপে ধরেছিল তার মাথা। ওর চুলের গন্ধও এই রকমই ছিল। বোধ হয় সব মেয়ের চুলের গন্ধই এক। অন্ধকার সিঁড়িতে, চওড়া খিলেনের নিচে, বেলে পাথরের ধাপে দাঁড়িয়ে গৌরীর চুলের সঙ্গে দেড়শো বছরের পুরনোবাড়ির গন্ধ মিলে, একটা প্রবল বন্য ইচ্ছা তৈরী করে দিয়েছিল। তখন সে বলেছিল, "আমায় বিয়ে করবে?" গৌরী মাথা নেড়ে অস্ফুটে "হ্যাঁ" বলেছিল আর গলা-জড়ান দুহাতে মুখটা টেনে নামিয়ে ধরে উঁচু হয়ে চুমু খেয়েছিল

পরপর তিনচারটে। তারক মনে করতে চেষ্টা করল, গৌরী হঠাৎ ছুটে উপরে চলে গেল কেন! যাবার আগে ব্লাউজের বোতামগুলো কি ঠিক ঠিক লাগিয়ে নিয়েছিল? এর সপ্তাহ খানেক পরই, গোপাল বলেছিল, "গৌরীকে বিয়ে করবি?" কি প্রসঙ্গে ও বলেছিল?

তারক মন্থরভাবে হাঁটতে শুরু করল। সূর্যটা জি, পি, ও-র গম্বুজের আড়ালে পড়ে গেছে। সার বেঁধে লোক চলেছে বৌবাজার স্ট্রীট দিয়ে শেয়ালদায় ট্রেন ধরতে। কাতর চোখে মেয়েরা বাসস্টপে অপেক্ষা করছে। বাসে জানলার ধারে বসা একটি বৃদ্ধ মুখ তুলে আকাশে কি যেন দেখছে। দুটি ইওরোপীয় পুরুষ ও নারী কথা বলতে বলতে মোটরে উঠছে।

পুরুষটি প্রৌঢ়, কিন্তু তার খাড়া শরীর আর চলনের সতেজ ভঙ্গি ভাল লাগল তারকের। সেই তুলনায় নারীটিকে নেহাৎই ভেতো-ভেতো ঠেকছে। অনেকটা রেণুর মত। দুজনকে যতক্ষণ দেখা যায় দেখার পর, সিদ্ধান্তে এল পুরুষরা মেয়েদের থেকে বেশি আকর্ষণীয়। তারক ঠিক করে ফেলল, ফোন করে জানিয়ে দেব আজ যেতে পারলুম না রোববার সকালে গিয়ে নিয়ে আসব। তিন মাস থাকতে পারলে আর তিনটে দিন কি পারবে না? লিখেছে নতুন বাচ্চাটা নাকি হুবহু আমার মত দেখতে হয়েছে। অমুটা রাত্রে 'বাবা-বাবা' বলে ফুঁপিয়ে উঠেছিল একদিন। ওকে ইংরিজি স্কুলে ভর্তি করাব সামনের বছর।

তারক থেমে পড়ল একটা ওষুধের দোকান দেখে। ইঞ্জেকসান নিতে হবে, এই কথাটা মনে পড়ায় দোকানটার দিকে এগিয়ে এসেও ইতঃস্তত করল। ভেবে দেখল, এখন নিলে বারোঘণ্টা পর কাল ভোরেই পরেরটা নিতে হবে। ভোরবেলা কোথায় ইঞ্জেকসান নিতে যাব? বরং আটটা-নটার সময় নিলে সকাল-রাত্রি দু' বেলাতেই সুবিধা হবে।

দেখে তারক দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। চেয়ারে একটি রুগ্ন মেয়ে কাত হয়ে হাতলে হেলান দিয়ে বসে। কাঁধ থেকে আঙুল পর্যন্ত হাত, দুই কাঁধের পুট, বাহুর ডৌল, কণ্ঠা, হনু, সব মিলিয়ে তারকের মনে হল তেরো-চৌদ্দ বছরের গোঁপ না ওঠা একটি ছেলেব মত। রঙটা মাজা। তাঁতের শাড়িটা মডমড়ে ফোলান-ফাঁপানো। উপবের বা নিচের মেয়েলি ঘাটতিগুলোকে সামাল দেবার জন্যই। তারকের দিকে সে তাকাল। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। সেই সময় দরজার আড়াল থেকে উকি দিল সলিলেব মুখ।

"গুহ যে, কি ব্যাপাব! অফিস যাওনি কেন? কতক্ষণ এলে?"

তারক যৎপরোনাস্তি অবাক হয়ে বলল। সলিল দ্রুত চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, মেয়েটিও।

"তারকদা অনেকক্ষণ বসে আছি।"

"আজ হঠাৎ ডুব দিলে যে?"

তারক ঘরের মধ্যে এল। মেয়েটি গোছগাছ করে নিচ্ছে কাঁধের কাপড়। সলিল ওর দিকে হাত তুলে বলল, "এ হচ্ছে অনীতা। একটা দরকারে, মানে জরুরী দরকারে আমরা আপনার কাছে এসেছি।"

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই অনীতা ঝটতি তারককে প্রণাম করল। বাধা দেবার জন্য সে ঝুঁকে পড়তেই দেখল ব্লাউজটা কোমর থেকে উঠে যাওয়ায় শিরদাঁড়ার একটা গ্রন্থি ফুলে রয়েছে। তারক অস্বস্তি বোধ করল। প্রণামটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল বলে তার মনে হল।

"আমাদের বাড়ির কাছেই থাকে। এবার পার্ট টু দেবে।"

"ওহ তাই নাকি!" চাউনিতে প্রশংসা মিশিয়ে তারক তাকাল। মেয়েদের চোখে সে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারে না। সলিলকে বলল, "দাঁড়িয়ে কেন, বোস।"

"বসছি।"

কিন্তু ওরা কেউই বসল না। সেটা তারকের ভালই লাগল।

"আমার বোনের সঙ্গেই পড়ে, খুব বন্ধু ওরা। আমিও ওদের বাড়ি অনেকদিন ধরেই যাচ্ছি।"

তারক মুখখানি স্মিত করে রইল। একবার ভাবল, রসিকতা করা যায় কি না। এই মেয়েটিকে দেখাবার জন্যই কি অফিস কামাই করেছে ?

"তারপর যা হয় আর কি।" সলিল হাসবার চেষ্টা করল। অনীতা চোখ নামিয়ে নিল।

"একটু বস তাহলে। তোমার বৌদিকে আজ আনতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু যা বাসের অবস্থা, উঠতেই পারলুম না। রোববার ছাড়া যাওয়া যাবে না।"

"বাচ্চা কেমন আছে ?"

"ভাল।" তারকের মন্দ লাগল না দেড়মাস বয়সী পুত্রের কুশল জানায় সলিলের আগ্রহে।

"উনি প্রথম এলেন, যা হোক কিছু আতিথেয়তার ব্যবস্থা তো করতে হয়।"

এরপর যথারীতি টানাহ্যাঁচড়া শুরু হল কথাটা নিয়ে। অবশেষে, শুধু চা ছাড়া আর কিছু নয় এবং যেহেতু অনীতা অনেক কনিষ্ঠ তাই সম্বোধনে একজনকে তুমি, অন্যজনকে আপনি বলা চলবে না, এই দুটি সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তারক দোতলায় এল। তালা খোলার শব্দ পেয়ে বঙ্কুবিহারী তার ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "কে ?"

"আমি।"

"যাসনি ?"

"না, এই সময় কি বাসে ওঠা যায় ? ফোন করে বলে দিয়েছি রোববার যাব।"

তারক মনে মনে ঠিক করে রাখল, কাল অফিসে গিয়েই ফোন করবে।

"আর এদিকে আমি গয়লাকে বলে এলুম—" ব্যস্ত হয়ে বঙ্কুবিহারী চটি পরতে পরতে বলল, "ওরা কারা, অনেকক্ষণ বসে রয়েছে?"

"আমাদের অফিসেরই। মেয়েটির সঙ্গে ওর বিয়ে হবে।"

ঘরে ঢুকেই ঘড়ি দেখল তারক। চা খাইয়ে ওদের তাড়াতাড়ি বিদায় করেই বেরোতে হবে ইঞ্জেকশান নিতে। বাইরের লোকেদের জন্য বারো টাকা কিলোর চা আলাদা কিনে রাখা আছে। রেনুর বাপের বাড়ির লোকেরাই খায়। ক'মাস রেণু নেই, তাই ওদের আর আসার দরকার হয়নি। হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে চায়ের পাতা। আলমারি থেকে চায়ের কৌটো বার করে তারক গন্ধ শুঁকছিল এমন সময় দরজার কাছ থেকে সলিল বলল, "তারকদা একটা কথা আছে।"

চমকে তারক ফিরে তাকাল। এত নিঃসাড়ে উপরে উঠে এসেছে কেন? দেখে মনে হয় ভূতে পেয়েছে।

"কি কথা?"

"আপনার সেই ডাক্তারের কাছে একবার যেতে হবে।"

"কোন ডাক্তার?"

সলিল ঘরের মধ্যে দু-পা এগিয়ে এল। হাত দুটো মুঠো করা নিঃশ্বাস দ্রুত, শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে।

"তোমার আবার ডাক্তারে কি দরকার?"

"তারকদা অনীতা প্রেগনান্ট, এর জন্য আমিই দায়ী।"

আনাড়ি অভিনেতার মত কোনক্রমে মুখস্ত সংলাপ বলেই সলিল হাত দুটো দেহের সঙ্গে সেঁটে কাঠ হয়ে রইল।

"সে কি! কি করে হল? বলেই তারক বুঝল তার বলাটাও আনাড়ির মত হল। কি করে হল, সেটা জিজ্ঞাসা না করলেও চলত।

হতভম্ব ভাবটা কাটাতে, আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সামলাবার জন্য বলল, "তুমি এমন কাজ করে ফেললে, শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলে হয়ে ?"

"বিশ্বাস করুন, আমি ওকে বিয়ে করব।"

"তা হলে করে ফেল, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার কি ?"

"লোকে বলবে কি যদি বিয়ের ছ'সাত মাস পরই বাচ্চা হয় ? বিয়ে হতে হতেও তো কিছুদিন লাগবে।"

"লোকে বলবে কি।" তারক পুরোপুরি বিরক্তি চাপতে পারল না। সলিল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। নাটকে লেখা নেই এমন একটা সংলাপ বলে তারক যেন তাকে বিপদে ফেলেছে। এবার কি বলতে হবে তার জানা নেই। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে সে তারকের পা জড়িয়ে ধরল।

"যদি না হেলপ করেন, তাহলে স্যুইসাইড ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। তারকদা আপনিই বাঁচাতে পারেন আমাকে।"

তারকের মনে হল, দামড়াটাকে একটা লাথি কসাই। আমায় কি মা-ঠাকুমা পেয়েছে যে মরার ভয় দেখাচ্ছে ! নকসা করার আর লোক পেল না। কালকেই ক্যান্টিনে বোসদার মুখে 'নকসা' কথাটা শুনে তার ভাল লেগেছিল। কথাটা যে এত শিগ্‌গিরী ব্যবহার করতে পারবে, ঘুনাক্ষরেও ভাবেনি। মনে মনে ভাবার সঙ্গে চেঁচিয়ে বলায় আর তফাত কি !

"আমার মনে হয় তোমার বিয়ে করাই উচিত। এই সব রিস্কি কাজ না করাই ভাল।" তারক প্রায় বলে ফেলেছিল, পেট খসানোর মত পাপ কাজ আর নেই। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কথাটা খুব অশ্লীল শোনাবে বলে তার মনে হল।

"তাছাড়া প্রেম করছ, বিয়ে করবে বলেই তো ?"

শেষে এইটুকু জুড়ে দিয়ে তারক ঘাড় নিচু করে সলিলের দিকে

তাকাল। চাঁদির কাছে চুল পাতলা হয়ে এসেছে, বোধ হয় ওর টাক পড়বে। মেয়েটা একা নীচে বসে এখন নিশ্চয় ভাবছে—রাজি হয় যেন হে ভগবান, রাজি হয় যেন। ওর ভগবান—তারকের মনে হল—এখন তারক সিংহ ছাড়া আর কেউ নয়।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। তারক ধাক্কা দিল সলিলের কাঁধে। "উঠে দাঁড়াও, কে আসছে যেন।"

ধড়মড়িয়ে সলিল দাঁড়াল। দরজায় দেবাশিসকে দেখে তারক চায়ের কৌটোটা এগিয়ে ধরে বলল, "চটপট চা করে দাও। উনুন যদি না ধরে থাকে তো স্টোভে কর।"

"আপনি রাতে খাবেন তো?"

"না না এখনি বেরোব, খেয়েই ফিরব।"

দেবাশিস যাওয়া মাত্র তারক বলল, "এসব খুব রিস্কি ব্যাপার, লাইফ নিয়ে টানাটানি হতে পারে, খরচও অনেক"

"আমার ছশো টাকা ব্যাঙ্কে আছে।"

তারক লক্ষ্য না করে পারল না, টানাটানির প্রসঙ্গটায় সলিলের মুখে উদ্বেগ বা শঙ্কা ফুটল না।

"ডাক্তার, রাজি হবে কি না, তাও বলা যায় না।"

তারক ঘড়ি দেখল। এদের চা খাইয়ে বিদেয় করতে আরো আধঘণ্টা। তাহলেও নটা বাজতে অনেক বাকি থাকে। আশ্বস্ত হয় সে আলগাভাবেই বলে ফেলল, "তুমি ঠিক জান কি, ওর পেট হয়েছে?"

"ও যা যা বলেছে, তার সঙ্গে বই মিলিয়ে দেখেছি, তাছাড়া বাড়িতেও তো বৌদিকে দেখেছি।" তারপর ইতঃস্তত করে সলিল বলল, "ওর ইউরিন টেস্টও করিয়েছি।"

"ও কি বলে?"

"কিসের?"

"এই অ্যাবোরশন করান সম্পর্কে?"

তারক সাবধান হল এবার। 'পেট' শব্দটা কেমন যেন মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। বোসদা 'চুচি' বলায় একবার সলিল ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেছল। পরে বলেছিল, 'স্তনকে এমন কদর্য ভাষায় বলার কি যে কারণ, বুঝি না।'

"কি আবার বলবে, সব কিছু আমার ভরসায় ছেড়ে দিয়েছে। এখন আপনি ছাড়া আর আমাকে বাঁচানোর কেউ নেই তারকদা।"

সলিলকে এগোতে দেখে তারক পিছিয়ে এল। আবার বোধ হয় পায়ে পড়বে। একটি যুবা দেহকে এই ভঙ্গিতে দেখার মত কদর্যদৃশ্য আর কি হতে পারে। তাই তারক, বলল "নিচে চলো, ও অনেকক্ষণ একা বসে আছে।"

বলেই সে সলিলের পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ওদের দেখেই অনীতা সিধে হয়ে বসল। চোখে প্রভূত জিজ্ঞাসা। উপরে দুজনের কি নিয়ে কথা হচ্ছিল তা নিশ্চয় জানে। তারক ভাবল, এইটুকু তো মেয়ে এতবড় একটা ব্যাপার যখন ঘটেছে নিশ্চয়ই কাঁটা হয়ে আছে উদ্বিগ্ন চিন্তায়। ওকে কিছু একটা বলে আশ্বস্ত করা দরকার। কিন্তু কিভাবে শুরু করা যায়!

"তোমার বৌদি এলে অনীতাকে নিয়ে একদিন আসবে, কেমন? নেমন্তন্ন করে রাখলুম।"

তারক সহজভঙ্গিতে, লঘু স্বরে সলিলের দিকে তাকিয়ে বলল এবং অনীতার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, "আসবে তো?"

ঘাড় নাড়ার আগে অনীতা অনুমোদনের জন্য সলিলের দিকে তাকাল। ভাসাভাসা চোখ, হাত, গলা, ঠোঁট, চিবুক—সবমিলিয়ে করুণার উদ্রেক করে। গুহ যে কি দেখে মজল তারক ভেবে পাচ্ছে না। শাড়ির বদলে হাফ প্যান্ট আর সার্ট পরে যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, কেউ তো ফিরেও তাকাবে না।

"আসবো।"

"তুমি কি খেতে ভালবাসো ?"

তারকের মনে হল, এই ধরনের কথাবার্তায় নেহাত বাচ্চাদের মন থেকেই গুরুভার নামানো যায়। কলেজ ছাত্রীর জন্য অন্য ধরণের আলাপের ভাষা দরকার, সেটা যে একদমই জানেনা তবে একটা ব্যাপার অবশ্য ভাল ভাবেই সে জানে কোনদিনই ওদের নেমন্তন্ন করা হবে না।

"যা পাই তাই খাই।"

এমনভাবে বলল যেন এইসব কথার কি উত্তর দিতে হবে ওর, জানা আছে। ওর স্বরে ক্লান্তি ফুটে উঠে যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে, এখন ধানাই-পানাই করে নষ্ট করার মত মনের অবস্থা নেই। তারক ঘড়ি দেখতে দেখতে ভাবল চা করতে দেবুর এত দেরী হয় কেন ?

"তারকদা তাহলে কাল আপনার সঙ্গে কখন দেখা করব ?"

"অফিসেই তো দেখা হবে।"

"ভাবছি, কদিন ছুটি নেব।"

"আমার বন্ধু প্রণবের সঙ্গে কাল সকালে দেখা করে, তবেই তোমায় বলতে পারব। তুমি বরং দুপুরে একবার ফোন করো।"

চা নিয়ে দেবাশিস ঘরে ঢুকছে। তারক ভাবল, আবার একটা বেগার খাটার কাজ ঘাড়ে চাপল। গুহ যদি ওকে বিয়ে করে ফেলে বা বিষ-টিষ খেয়ে দুজনের কেউ মরেও যায়, তাহলেই তো ল্যাঠাচোকে। কিন্তু এইভাবে কথাগুলো মনে হওয়ামাত্র তারক বিরক্তবোধ করল নিজের সম্পর্কেই। টুয়েলফথম্যানের মত ভাবা হল যেন। খেলার আগের দিন ঠিক এই রকম একটা ভাবনা কিছুক্ষণের জন্য তার মাথায় ঝিলিক দিয়েছিল—ধ্রুব মুখুজ্যের কি বরেন মিত্তিরের যদি এখন দারুন অ্যাকসিডেণ্ট হয়। তাহলে আমি টিমে এসে যাব। চায়ে চুমুক দিতে দিতে তারক আড়চোখে ওদের দেখল। এদের কেউ বিষ-টিষ খেলে, সে ভাবল, আমি কোন টিমের ভেতর চলে আসব ? টিম কোথায় !

॥ চার ॥

খাট আলমারি দেয়াল জানলা সব কিছুই যেন চেটে চেটে খাচ্ছিল। ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল চোখ দুটো। তখনই মনে হয়েছিল মা এইবার মরবে।

"তারু ছবিটায় আমার সিঁথেয় সিঁদুর দিতে বলিস তোর বৌকে। আর তোলা উনুনটার শিকগুলো যেন ফেলে না দেয়। বলতে ভুলিস না। মনে থাকবে তো? কাশী মিত্তির ঘাট থেকে পাঁচ সিকি দিয়ে কিনেছিলুম।"

ফুলশয্যার রাতে রেণুকে বলেছিলাম মার ইচ্ছে ছিল ছেলের বৌ তাঁর শাশুড়ির ছবিতে সিঁদুর দেয় যেন। রেণু ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, "সতী সাবিত্রী ছিলেন তাই সিঁদুর বজায় রেখে চলে গেলেন।" রেণুকে তছনছ করে যখন পিষতে শুরু করি একটা অদ্ভুত আওয়াজ ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, শেষ দিকে যেভাবে যন্ত্রণায় মা কাতরাতো। মনে পড়া মাত্রই বিরক্তি হয়—ছবিটা এ-ঘরে টাঙানো রয়েছে কেন? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছবির কথা ভুলে যাই। রেণুর মুখথেকে গোঙানি শোনার ইচ্ছেটা তখন প্রবল বেগে শরীর তোলপাড় করছিল। পরের দিন মনে হয়েছিল, ছবি শুধুই ছবি। ওগুলো টাঙিয়ে রাখা হয় শুধু মন খচ্‌খচ্‌ করানোর জন্য। অতীতকে জীইয়ে রাখে ব্যর্থ লোকেরা। যদিও আমি এগারোজনের টিমে আসতে পারিনি তবু ছবিতোলার সময় ওদের সঙ্গে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এ ছবি টাঙিয়ে রাখার মধ্যে গৌরব কোথায়?

সেদিন শেষরাতে বেশ শীত পড়েছিল, তাই বাবা যখন ঠেলে

তুলল বিরক্তিতে লেপটা ছুঁড়ে ফেলে খিঁচিয়ে বলেছিলাম, "তা আমি কি করব ?"

"ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন আর বলিস একটা ডেথ সার্টিফিকেটও যেন লিখে নিয়ে আসেন।"

বাবা এত আস্তে কথা বলতে পারে জানতাম না। কুয়াশায় আবছা রাস্তা দিয়ে ডাক্তাবের বাড়ি যেতে যেতে মনে হয়েছিল এইবার টুয়েলফথম্যান সেজে দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেব। ভাবতেই শরীর গরম হয়ে এসেছিল। শীত করেনি আর। মার জন্যই পারিনি, এবার পারব মারা গেলেই ছবিটা খুলে ফেলা যাবে, কেউ বারণ করার রইবে না।

অথচ আজও খোলা হয়নি! গড়িমসি ছাড়া আর কি। দোকানটার সামনে পায়চারি করতে করতে তারক আপনমনে বলল, বাধাটা কোথায় ? তবে ঢুকে পড়ায় কেন গড়িমসি করছি ! রোগটা যখন জানা হয়ে গেছে, শুধু তো ইঞ্জেকসান নেওয়ারই অপেক্ষা।

কিন্তু দোকানে বসা লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয় মিথ্যাবাদী আর পরশ্রীকাতর। বাসে টিকিট কাটে না। বাজারে ওজন নিয়ে ঝগড়া করে। বৌ জানলায় দাঁড়ালেই খেঁকায়। রাস্তায় ঝিয়েদের জঞ্জাল ফেলার সময় হলে রকে এসে বসে –তারক এইসব অনুমান করতে করতে কয়েকবার ভিতরে তাকাল। একটি মাত্র খদ্দের কিসের একটা কৌটো কিনে চলে গেল। তারক ভাবল এইবার ঢুকলে কেমন হয়। এই সময় একটি বৃদ্ধাকে ঢুকতে দেখে সে আর এগোল না।

ঘড়ি দেখে, খানিকটা হাঁটল উত্তর দিকে। সিনেমা ভাঙ্গা ভীড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধাক্কা খেল। আবার ফিরে এল দোকানটার সামনে। একটিও খদ্দের নেই। লোকটা গালে হাত দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে পা দোলাচ্ছে তাইতে থলথলে ভুঁড়িটা কাঁপছে।

কড়ে আঙ্গুল মুখে ঢুকিয়ে পানের কুচি বার করে আঙ্গুলটা তুলে দেখল তারপর জিভ দিয়ে কুচিটা টুক্ করে তুলে আবার চিবোতে লাগল।

তারক ভাবল এইসব লোক কৌতুহলীও হয় খুব। যদি বলে বসে হয়েছে কি? ইন্দ্র ভটচাজ দাদ সারাতে কি পেনিসিলিন নিয়েছিল? যদি বলে 'কই দাদটা দেখি?' ডাক্তারী করার সুযোগ পেলে এই সব লোক ছাড়ে না। কুঁচকিতে ফোড়া হলে নিশ্চয়ই দেখানোর কথা উঠবে না। বলা যায়না, পা দোলাতে দোলাতে হয়তো, বলবে 'তার জন্য তো কেউ পেনিসিলিন নেয় না।' কুতকুতিয়ে তাকাবে আর মুচকে হাসবে। দরকার নেই, অন্য অনেক দোকানই তো রয়েছে।

তারক কিছুটা হেঁটে আর একটা ওষুধের দোকান পেল। কাউন্টারের বাইরে দুটো লোক চেয়ারে বসে। হয়তো মিকশ্চার তৈরী করতে দিয়েছে। কম্পাউণ্ডারের মত কাউকে দেখা যাচ্ছে না। যে লোকটা খাতা খুলে হিসেব মেলাচ্ছে বা কসছে সে নিশ্চয় মালিক। কে কি জন্য পেনিসিলিন নিচ্ছে তাই নিয়ে একদমই মাথা ঘামাবে না। শুধু চোখের সামনে নোট তুলে জলছাপ দেখে সিকি-আধুলি কাঠের উপর বাজিয়ে নিয়ে আবার হিসেব কসতে শুরু করবে। লোকটা নিশ্চয় ছেলেদের জন্য মাস্টার রেখেছে। ছেলেগুলো নির্ঘাৎ স্কুল পালিয়ে ট্রামের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝোলে। বৌ হপ্তায় তিন দিন ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখে। কিন্তু কম্পাউণ্ডারটা কোথায়? সুইং ডোরটার ওধারেই নিশ্চয় আছে। মিকশ্চার বানাতে কত সময় লাগে? ইচ্ছে করেই দেরী করে ওরা। কিন্তু লোকটা জানে না এই দেরী করার জন্যই একটা ইঞ্জেকসানের খদ্দের সে হারাতে চলেছে। একটা টাকা পেত। তাই দিয়ে আধ কিলো চাল কিনে কিংবা কোবরেজি কাটলেট খেয়ে আজ বাড়ি ফিরতে পারত।

তারক ঘড়ি দেখে আবার হাঁটতে শুরু করল। একটা দোকানে

দেখল বেশ ভীড়। ডাক্তারকে ঘিরে অনেকগুলো মেয়ে-পুরুষ বসে। তারকের খুব পছন্দ হল কাউন্টারে বসা লোকটিকে। ময়লা শার্ট, কাঁচাপাকা চুল, চোয়ালটা ছড়ানো, গালভাঙা, গলাটা অসম্ভব সরু। বলামাত্র নিশ্চয় সিরিঞ্জটিরিঞ্জ বার করতে শুরু করবে। সে ঠিক করল এর কাছেই নেবে।

ঢোকবার আগে আশপাশ দেখে নিতে নিতে তারকের চোখে পড়ল অফিসের একটা লোক। নামটা মনে করতে পারল না তবে নিচের তলায় বসে। মুখচেনা। রাস্তায় উবু হয়ে ব্লাউজ পছন্দ করছে। ওষুধের দোকানটার সামনেও ফেরিওলা নিশ্চয় এখানে এসেও উবু হবে, তারপর এধারেও তাকাবে। যেই দেখবে ইঞ্জেকসান নিচ্ছি অমনি একগাল হেসে নিশ্চয় বলবে, কি ব্যাপার, হল কি আপনার ?

ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল, এই ভেবে তারক সরে পড়তে যাওয়ার আগেই লোকটা দেখে ফেলল।

“এখানে যে ?

শুনে জ্বালা করে উঠল তারকের সর্বাঙ্গ। এমন ভাবে বলল যেন দিল্লী কি বোম্বাইয়ে দেখা।

“এই একটা ওষুধ কিনতে এসেছি। কোন দোকানেই পাচ্ছি না।” তারক যতটা সম্ভব হেসে বলার চেষ্টা করল।

“কোন জিনিসই দরকারের সময় পাওয়া যায় না। কাল খুঁজতে খুঁজতে হন্মে হয়ে গেলুম ওয়াটারবটলের একটা গ্লাসের জন্য। ক্যানিং স্ট্রীট, মুরগিহাটা চষে ফেললুম, পেলুম না। তার আগে ছেলেটার স্কুলের বই নেওয়ার জন্য হ্যাণ্ডেল দেওয়া প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ খুঁজে খুঁজে পেলুম না। অথচ কদিন আগেই দোকানে দেখেছি। যে জিনিসটি দরকার দেখবেন উধাও হয়ে গেছে।”

মনে মনে তারক বলল, কিনছিলে তো বৌয়ের ব্লাউজ। ফুটপাথ থেকে কেনার লজ্জা ঢাকতে এত বাজে কথার দরকার কি।

"যা দিনকাল পড়েছে, জিনিসের দাম কি. আগুন সব!" তারক গম্ভীর মুখে বলল।

"আজ একটা সুখবর পেলুম। স্ট্যাটিসটিকাল সেকশানের মিস্টার ঘোষাল আর আমি এক ট্রামেই এলুম। উনি বললেন, যা ফিগার পেয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে শিগগিরি একটা শ্ল্যাব হয়তো বাড়বে।"

লোকটা জ্বলজ্বল করে, তাকিয়ে থাকল। তারক সঙ্গে সঙ্গে হিসেব করে দেখল, তাহলে তার ডি, এ, আট টাকা বাড়বে। এই লোকটারও হয়তো আট-ন টাকা বাড়বে। সেই আনন্দে বোধহয় বৌকে তিন টাকার উপহার দিচ্ছে

"যদি বাড়ে তাহলে তো ভালই।"

লোকটা যেন ক্ষুব্ধ হল। এমন আলগা উত্তর নিশ্চয় আশা করেনি। হয়তো ভেবেছিল শুনেই নৃত্য শুরু করে দেবে। তারক ঘড়ি দেখে বলল, "একটু তাড়া আছে, চলি।"

তারক হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ সে একটিও ওষুধের দোকান পেল না। অবশেষে এক ডাক্তারখানায় একটি যুবককে চুপ করে বসে থাকতে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরটা খুবই ছোট। দুটি মাত্র আলমারি। একটি টেবল, খান চারেক চেয়ার আর বেঞ্চ। আলমারি দুটির মাঝে দড়িতে পর্দার ওধারে নিশ্চয় তোষকপাতা বেঞ্চ বা চৌকি আছে, রোগী শুইয়ে পরীক্ষার জন্য। যুবকটি ছাড়া ঘরে কোন লোক নেই। তারক আলমারির সামগ্রীগুলো লক্ষ্য করল। শিশি, কৌটো, অ্যাম্পুল যা ডাক্তারদের আলমারিতে থাকা উচিত তাই রয়েছে, তবে ঠাশাঠাশি নয়। বোধহয় ওষুধ কোম্পানীর স্যাম্পেলগুলো জমিয়ে রেখেছে। দেখে মনে হয় বহু দিনের। তারক

ভাবল, ওষুধগুলো টাটকা না বাসি তা দিয়ে আমার কি। ছেলেটা কি ইঞ্জেকসান দিতে পারে ?

তারক ডাক্তারখানায় ঢুকল। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ডাক্তার-বাবু কলে বেরিয়েছেন ফিরতে আধঘণ্টা দেরী হবে।"

"আপনি ইঞ্জেকসান দেন ?"

"কি ইঞ্জেকসান ?"

"পেনিসিলিন।"

"বসুন "

খুশিতে তারক ধপ করে বসল। ডাক্তার বা অন্য কেউ আসার আগেই ব্যাপাবটা সেবে নেওয়া যাবে।

"পেনিসিলিন এনেছেন ?"

"এখানে পাওয়া যাবে না ?"

"না, ফুরিয়ে গেছে।"

"আচ্ছা নিয়ে আসছি।"

"সঙ্গে জলও আনবেন।"

তারক হনহনিয়ে গেল। সরুগলা, গালে গর্ত, চওড়া চোয়ালওলা লোকটাকে বলল, "পাঁচ লাখ পেনিসিলিন আর একটা জল দিনতো।" একটা টাকা দিয়ে, খুচরা পয়সা না গুনেই, হনহনিয়ে আবার ফিরে এল।

পর্দা তুলে যুবকটি বলল, "ভেতরে আসুন।"

তারক ভিতরে এসে দেখল, যা ভেবেছিল তাই। অয়েলক্লথের মত কি একটা তোষকের উপর পাতা। তোষক দেখে মনে হয় ছারপোকা আছে। বসে থেকে সে দেখল স্পিরিট দিয়ে সিরিঞ্জের শুদ্ধিকরণ, করাতে ডিস্টিল ওয়াটার অ্যাম্পুলের মাথাটা ঘষে ঘষে মুট করে ভেঙে ফেলা, পেনিসিলিন শিশির টিনের পাতমোড়া মাথা থেকে

ঢাকনা তুলে ছুঁচ ফুটিয়ে জল ঢুকিয়ে দেওয়া, শিশিটাকে ঝাঁকিয়ে গুঁড়ো পেনিসিলিন গলিয়ে ফেলা।

দেখতে দেখতে তারক খুব আরামবোধ করল। রোগমুক্ত হওয়ার নির্ভাবনা আসা মাত্র তার গা দুলে উঠল, গ্রন্থিগুলোয় যত জট পাকিয়ে ছিল খুলে গেল, শরীর থেকে বছরের পর বছর ঝরে যেতে থাকল। সে দম বন্ধ করে রইল ভারশূন্য বোধটাকে লুটোপুটি খাওয়ার সুযোগ করে দিতে।

"ডান হাতে না বাঁ হাতে?"

স্পিরিট ঘষে যুবকটি তার বাহু পরিষ্কার শুরু করল। এত অনায়াসে আগে কখনো কি কোন অঙ্গ সে নাড়িয়েছে? তারক মনে করতে পারছে না।

"শুয়ে পড়ুন বাঁ কাত হয়ে।"

দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে তাকাতেই তারক দেখল নোনা লেগে বালি খসে ইট বেরিয়ে! স্কুলের ম্যাপে ভারতবর্ষের মত রঙ। ইংরেজ আমলে ওই রঙ ছিল, এখন কি হয়েছে কে জানে! লম্বা লাঠির ডগাটা হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গঙ্গার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার সময় কেশববাবু বলেছিলেন, এই নদীই হচ্ছে ভারতের ইতিহাস, ভারতের আত্মা, ভারতের দর্শন। পানু ডুবে মরেছিল গঙ্গায়। আহিরিটোলা ঘাটে জেটির নীচে শেকল জড়ানো ফ্যাকাসে শরীরটা দুদিন পরে পাওয়া যায়।

"শক্ত করবেন না তাহলে লাগবে।"

যুবকটির নিঃশ্বাসের শব্দ তারক শুনতে পাচ্ছে। পেনিসিলিন নিতে গিয়ে কেউ কি মরেছে? ছোকরার হাত কাঁপছে। ছুঁচ ফোটার সময় পট করে শব্দ হল না তো! আস্ত বড় মাছ কোটার আগে মা ডাকতো, তারক আয়, পটকা ফাটাবি। গোড়ালি দিয়ে লাথি দিলেই পট করে ফেটে যেত।

"আঃ "

"লাগছে? ভেতরে ঢোকার সময় একটু লাগবে "

লাগুক। তারক চোখ বুজে ভাবল, এতো খুবই সামান্য ব্যথা। মা বলল, তোর ভালর জন্যই মেরেছে। বড় হয়ে বুঝবি। শুধু খেলে বেড়ালেই কি চলে? পরীক্ষায় ফেল করলে লোকে কি বলবে, তোর বাবার মাথাও তো হেঁট হবে। এইরকম জোরে জোরে নয়, আরও আস্তে আস্তে আলতো করে মা বুক পিঠ গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

"এখন কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন।"

মা চলে গেল রান্নাঘরে। তখন ভাবতে লাগলুম পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে বাবাকে অপমান করব। স্কলারশিপের টাকায় পড়ব। ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে যাচ্ছিল। শুনতে পেলুম মা চাপা ধমক দিচ্ছে, কচি ছেলেকে ওইভাবে মারে? দু একদিন যদি স্কুল কামাই করে খেলতেই যায়, তাতে কী এমন সব্বোনাশ হয় যে চোরের মার মারবে?

ওর ভালর জন্যই মেরেছি।

মরে গেলে তখন ভাল করা যে ঘুচে যেত।

ওর খেলা আমি ঘোচাব। কালই মল্লিকমশাইকে গিয়ে বলছি, আপনার বাগানে ছেলেদের খেলা বন্ধ করে দিন।

কাত হয়ে চোখ বুঁজে ভাবতে ভাবতে তারকের হাসি পেল। গগন বসুমল্লিকের সামনে দাঁড়াবার কোন যোগ্যতাই ছিল না বঙ্কুবিহারী সিংহের। তার ছেলেরও ছিল না। গোপাল বলেছিল, জাতে না মিললো তো কি হয়েছে, আসলে দেখতে হয় চরিত্র। তুই কি খারাপ ছেলে? রাজি থাকিস তো মাকে বলি।

"এইবার উঠুন।"

তারক উঠে বসল। একটা টাকা দিল যুবকটিকে।

"আপনি কি রোজ নেবেন?"

"হ্যাঁ।"

"কটা নেবেন?"

"সাতদিন, দুবেলা করে।"

"সকালে নটায় ডাক্তারখানা খোলে।"

"কিন্তু অত দেরী করলে তো আমার চলবে না। নটায় অফিস বেরোই।" তারক ঘড়ি দেখল। নটা বেজে দশ। কাল সকাল নটা-দশে বারো ঘণ্টা পূর্ণ হবে।

"ঠিকানা দিন নটার মধ্যেই বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসব।"

আঁতকে উঠল তারক। বাড়িতে বঙ্কুবিহারীর সামনে ইঞ্জেকসান!

"সকালে একজনের কাছে নিচ্ছি। রাতে তাঁর অসুবিধা বলেই আপনার কাছে এলুম।" এই মিথ্যেকথাটুকু বলবার জন্য তারক দুঃখবোধ করল।

একটি টাকা হাতছাড়া হওয়ায় যুবকটি ক্ষুণ্ণ হল। পেনিসিলিনের খালি শিশিটা দেখে তারকের মনে হল অমুর খেলনা হতে পারে এটা। কিন্তু ওর মা বা দাদু যদি জানতে চায় কি করে এটি সে পেল?

বাইরে এসে তারক প্রফুল্ল বোধ করতে লাগল। দশ পয়সার একটা সিগারেট কিনে, ধরিয়ে, ট্রাম বাস মানুষ ইত্যাদি দেখতে দেখতে তার মনে হল, রেণুকে এখন না আনাই ভাল। তিন মাস স্বামীসঙ্গ না পেয়ে ও নিশ্চয়ই কাতর। কিন্তু এলেও সাতদিন সবুর করতেই হবে। তাকি ওর পক্ষে সম্ভব? আসার সময় একটা চুমু দিয়েছিলাম, দিন পঁচিশ হয়ে গেল, তখন শরীরটাকে দুমড়ে বেঁকিয়ে দিচ্ছিল। পাউডারের গন্ধর সঙ্গে ব্লাউজ থেকে বাসি দুধের টকটক গন্ধও পেয়েছিলাম। সাতদিন ঠেকিয়ে রাখার জন্য ভাল মত অজুহাত চাই। তারক খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

রাত্রে ঘুম এল না। রেণুকে সাতদিন পর আনলেই হবে কিন্তু

কাল সকালেই দ্বিতীয় ইঞ্জেক্‌সান কোথায় নেবে, এই ভাবনা তারককে পেয়ে বসল। ক্রমশঃ সে বিরক্ত এবং অসহায় বোধ করতে লাগল। এরপরও আছে প্রণবের কাছে গিয়ে অনীতাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা। ওকে রাজি করাতে হবে। সেজন্য বোঝাতে হবে এ ঘটনার জন্য সমাজই দায়ী, নয়তো গতবই নাড়াবে না। কিন্তু কোন কথাগুলো বললে প্রণব পটবে তারক কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না! এইসব ঝুটঝামেলা আমার ঘাড়েই বা চাপে কেন?

তারক অক্ষম রাগে নিজেকেই দায়ী করতে থাকল। দয়া মায়া মমতা—যেকটা ছেঁদা আছে সব বন্ধ করে দেব, দেখি কোনখান দিয়ে ঝামেলাগুলো ঢোকে। ইণ্টারভিউ পাইয়ে দাও, পেট খসিয়ে দাও, খালি আবদার আর আবদার। ভেবেছে কি আমায়, বেগার খাটার লোক! শুধু ফিল্ডিং দেবার জন্যই ডাকবে?

পায়ের ডিম আর উরুর পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল তারকের। মাথার মধ্যে ঝনঝনানি শুনতে পাচ্ছে। ভেবেছে কি, ভেবেছে কি মনে মনে সে আউড়ে চলল। বালিশটাকে পাঁচ আঙুলে চেপে ধরে সে ভাবল এইবার উপড়ে নেব ওর ড্যাবড্যাবে চোখ। শুধু দুটো খোঁদল দগদগ করবে। অন্ধ হয়ে হাতড়ে হাতড়ে চলবে। ছেলেদের মত রুগ্ন হাত দেখলে মায়া হয়। ও দুটো ছিঁড়ে নেব, শিরদাঁড়াটা পিঠ থেকে টান দিয়ে ছাড়িয়ে নেব—ভেবেছে কি, বেগার খাটার লোক? নেভাবার জন্য জ্বলন্ত সিগারেট ঘষবে আমার গায়ে?

দয়া-মায়া-মমতা থেকে রেহাই পাবার জন্য তারক হিংস্রভাবে বালিশটাকে তলপেটের নীচে চেপে অনুভব করল, সকালে ট্রামে যেভাবে চুলের গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল, সেই রকম শ্বাসরোধকারী উত্তেজনা। স্ত্রীলোকটিকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে দেখল, তেল চিটচিটে ব্রেশিয়ারের স্ট্র্যাপ। তারপরই দেখতে

পেল, শিরদাঁড়ার একটা ফুলে ওঠা গ্রন্থি। তখন প্রাণপণে সে, গৌরীকে আঁকড়ে ধরতে গেল। দেড়শো বছরের বাড়ির অন্ধকার সিঁড়ির খিলেনের তলা দিয়ে গৌরী ছুটে উপরে উঠে গেল। কাতরস্বরে তারক বারকয়েক, গৌরী, গৌরী, বলে ডেকে ধীরেধীরে এলিয়ে পড়ল বালিশে।

কিছুক্ষণ পর তারক উঠল। জলখেয়ে, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে, পুরো একটি সিগারেট শেষ করতে করতে নিজেকে আর বেগারখাটার লোক বলে মনে করতে পারল না। সলিলের মতই প্রায় শ্যামল গাঙ্গুলির পায়ের উপর হুমড়িখেয়ে পড়েছিল রবি বোস।—"ইনিংস ডিফিট খাবো? শ্যামল তুই থাকতে বাংলার এ অপমান দেখতে হবে?" শ্যামল ছিল বাংলা দলে অটোমেটিক চয়েস। সেদিন সাতাত্তর রান করে শ্যামল ইনিংস ডিফিট থেকে বাংলাকে বাঁচায়।

এখন তারকের মনে হচ্ছে সে যেন শ্যামল গাঙ্গুলি। সলিল গুহ আর রবি বোস একই লোক। বাঁচাবার আবেদন দুজনেরই হাতে। টুয়েলফথম্যানের কাছে কি কেউ করুণার পাত্র হয়ে আসে? তারক নিজের মনে হাসল এবং নিজেকে শুনিয়ে বলল -টি, সিনহা তাহলে বাপু সাতাত্তরটি রান করে এবার তোমার এলেম দেখাতে হবে।

পাঁচ

"তোর বোন ?"

"না না আমার নিজের বোন কোথায়, মাসতুতো বোন।"

তারক ব্যস্ত হয়ে প্রণবকে শুধরে দিল। মেজমাসীর ছোট মেয়ে ইল্লাকে ভেবে রেখেছে সে। বছর তিন বোধ হয় দেখেনি, তখন শুনেছিল ক্লাস নাইনে পড়ে। অতএব এখন সে প্রেগনান্ট হবার মত যুগ্যিমন্ত হয়েছে নিশ্চয়।

প্রণবকে আনমনা হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকতে দেখে তারক কণ্ঠস্বর ধীর ব্যথিত করে বলল, "ব্যাপারটা এমনই, ওরা যে কি করবে ভেবেই পাচ্ছে না। মিশতে দিয়েছিল খোলা মনে। ভেবেছিল বিয়ে তো হবেই, ঠিকও হয়ে গেছল এই ফাল্গুনে, দুম করে ছেলেটা অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেল। তারপরই জানা গেল মেয়ে ইতিমধ্যে প্রেগনান্ট হয়ে গেছে। এখন অ্যাবোর্শন ছাড়া আর কি উপায় আছে, তুইই বল ?"

তারক ঝুঁকে রইল উত্তরের আশায়। প্রণব হয়তো বলতে পারে মিশতে দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে। সেটা মেনে নেওয়া যাবে। বলতে পারে মেয়েটার দিক থেকে নিশ্চয় আস্কারা ছিল বা সংযত হওয়া উচিত ছিল, বাপ-মা ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারেনি, তাও স্বীকার করে নেব। তারক ঠিক করেই রেখেছে কোন তর্কের মধ্যে যাবে না।

জানালার বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে প্রণব বলল, "পরিমল মারা গেছে জানিস ?"

তারক প্রস্তুত ছিল না কথাটা শোনার জন্য। অবাক হয়ে বলল, "কে পরিমল ?"

"কলেজে আমাদের সঙ্গেই তো পড়ত। কবিতা লিখত, পরিমল ভটচায "

তারককে তবু জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রণব বলল, "খুব নাম করেছিল, তিনখানা বইও আছে ওর। আমাদের ব্যাচে ওই একমাত্র যার নাম হয়েছে। কলেজে অবশ্য সবাই তোকেই চিনত।"

"কি করে মারা গেল ?"

এতক্ষণ ধরে বলা মাসতুতো বোনের সর্বনাশের কথা প্রণব যে কিছুই শোনেনি এতে তারক ক্ষুণ্ণ হল। তবু আগ্রহ না দেখালে প্রণব যদি ক্ষুণ্ণ হয় এই ভেবে আর একটু যোগ করল "ওঁর আছে কে ?"

"ক্যানসারে মারা গেল। বৌ আর সাত বছরের একটা ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। কলেজের লেকচারার ছিল, কত আর মাইনে পেত। কাল একটা মিটিং আছে মহাবোধি হলে, যাবি ?"

"কিসের মিটিং ?"

বলেই তারকের মনে হল জিজ্ঞাসা করাটা ঠিক হল না। কেউ মরে গেলে শোকসভা ছাড়া আর কি হতে পারে।

"কালকে তো ? যাবখন।"

মনে হচ্ছে প্রণব খুশি হল। তাইতে তারক মাসতুতো বোনের প্রসঙ্গ আবার তুলল, "তোর সেই ডাক্তারের কাছে একবার চল। মেয়েটা দুবার গলায় দড়ি দেবার চেষ্টা করেছিল। এখন সব সময় চোখে চোখে রাখতে হচ্ছে। কখন যে কি করে ফেলে। আত্মহত্যার এত জিনিস আজকাল হাতের কাছেই পাওয়া যায়।

"ডাক্তার শুনেছিলাম পুরী গেছে, ফিরেছে কি না খোঁজ নিতে হবে। পরিমলের মৃত্যুর খবরটা পাওয়ার পর থেকেই মনটা এত খারাপ হয়ে আছে।"

তারক বুঝতে পারছে না, ডাক্তারের পুরী থেকে ফেরার খবরটা নিতে বলার জন্য প্রণবকে এখন অনুরোধ করা চলে কিনা। একটা মেয়ে মরতে চেষ্টা করেছে আর একটা লোক মরে গেছে, এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোনটিতে মন বেশি খারাপ হয় এটা সে ঠিক করতে পারছে না।

"তাহলে রাতে একবার খোঁজ করব ?"

"রাতে ?" প্রণব কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "কাল মিটিংএ তো দেখা হবে, তখন তোকে বলব। আচ্ছা, তোর ছেলেটা কত বড় হল, স্কুলে ভর্তি করিয়েছিস ?"

"চার বছর তো বয়েস, আর একটু বড় হোক। ভাল কথা, খরচ কি রকম পড়বে বলতো ওই ব্যাপারটায় ?"

"তা আমি কি করে বলব, ডাক্তার যা বলবে তাই।"

প্রণবের কণ্ঠস্বর, উদাস চোখে জানালার বাইরে মাঝেমাঝে তাকানো এবং অ্যাশট্রে থাকা সত্ত্বেও মেঝেয় সিগারেটের ছাই ঝাড়া থেকে তারকের মনে হল, প্রণব তাকে পাত্তা দিতে ইচ্ছুক নয়। অথচ এই প্রণব পাঁচ বছর আগে একদিন বাড়ি বয়ে এসে টেস্টম্যাচের সিজন টিকিট চেয়েছিল। তখনকার প্রণবের মুখ আর এই মুহূর্তের টি, সিনহার মুখ হয়তো একই রকম, যেমন, তখনকার টি, সিনহার মেজাজ আর এখনকার প্রণবের ঔদাসীন্যে কোন তফাৎ নেই। সেদিন তারক শূন্যহাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এবার হয়তো প্রণব তার শোধ নেবে। একটা বিরক্তকর টেস্টম্যাচ না-দেখার দুঃখের সঙ্গে একটা মেয়ের মরণ-বাঁচনের সমস্যাটা কি প্রণব মিশিয়ে ফেলবে ?

তারক অতঃপর ভাবল, প্রণবকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। বড্ড বেশি যেন শোকাচ্ছন্নের ভান করছে। পরিমল তিনটি বই লিখেছে এবং আমি একবছরে গড়েরমাঠে আটটা সেঞ্চুরি করেছিলাম।

পরিমলের লেখা পদ্য পড়ার ইচ্ছে হলে দোকান থেকে বই কিনে আনলেই চলে, কিন্তু আমার সেঞ্চুরি মাঠে গেলেই আর দেখা যাবে না—এই জন্যই পরিমল খ্যাতনামা হয়ে থেকে যাবে। কিন্তু পদ্যের এক একটা লাইন যেমন হঠাৎ মনের মধ্যে ঝিলিক দেয় তেমনি এক একটা স্ট্রোকও কি দেয় না?

"তোর মনে আছি কি, কালিঘাট মাঠে সুভাষ গুপ্তের একটা গুগলি ডেনিস কম্পটনের মত হাঁটু ভেঙ্গে সুইপ করেছিলাম?" তারক আকুল চোখে তাকাল প্রণবের দিকে।

"লীগের খেলায়।" হঠাৎ এমন এক খাপছাড়া প্রশ্নে প্রণব অবাক।

"হ্যাঁ। তুই গেছলি সে খেলাটা দেখতে। আমি লাঞ্চের সময় তোকে দেখেছি স্কোরারের ঘাড়ের উপর ঝুঁকে স্কোরবই দেখতে। তারপরেই আমাদের ব্যাট ছিল।"

প্রণব কিছুক্ষণ ধরে মনে করার চেষ্টা করল এবং হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "কি জানি। বোধহয় অন্য মাঠে চলে গেছলুম। তবে রঞ্জি ট্রায়ালের ম্যাচটা দেখেছি।"

প্রণবের চোখে যেন চাপাহাসি ঝিলিক দিল। অন্তত তারকের তাই মনে হল। সেই ট্রায়াল খেলার প্রথম ইনিংসে তারক প্রথম বলটা এগিয়ে খেলতে গিয়ে ফসকে যায়, বল প্যাডে লাগল। তার 'আউট' প্রার্থনা করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল সারামাঠ। আম্পায়ারের যে কয়েকটি মুহূর্ত লেগেছিল সিদ্ধান্ত জানাতে, সেই সময়টুকুর মধ্যেই তারক দেখে মৃত্যুশয্যায় শায়িত একটি লোককে ঘিরে কিছু লোক উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে। আম্পায়ার মাথা নেড়ে নাকচ করার পর তারকের মনে হল সে ঠিকই ব্যাট পেতেছিল কিন্তু বলটা হঠাৎ ছিটকে সরে এল মাটিতে পড়ে। কারণ অনুসন্ধান করবে কিনা ভেবেছিল। কিন্তু করেনি। দ্বিতীয়

বল সাবধানে পিছিয়ে খেলবে স্থির করে, ব্যাট ধরে যখন বোলারের দিকে তাকিয়ে তখন তার মনে হল প্রায় ছ'গজ দূরে গুডলেংথ স্পটের উপর একটা কাঁকর। ছুটে আসা বোলারের থেকে লহমার জন্য চোখ সরিয়ে তারক সেই দিকে তাকিয়েছিল। তখন একবার মনে হয়েছিল, বোলারকে থামিয়ে পীচে কাঁকর আছে দেখে নেব কিনা! সিদ্ধান্ত নেবার আগেই বলটা পড়ল গুডলেংথ স্পটে এবং একচুলও না উঠে, মাটি ঘষড়ে এল। ব্যাট নামাবারও সে সময় পেলনা। উইকেটকীপার ছিল তপন ঘোষ। ফ্যালফ্যাল করে ভাঙ্গা উইকেটের দিকে তাকিয়ে থাকা তারককে বলেছিল, "সেকেণ্ড ইনিংসতো আছে, ঘাবড়াসনি।" অপর উইকেটে দাড়ান নন্-স্ট্রাইকার অরুণাভ ভট্চাযের চোখে তারক যেন স্বস্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখেছিল। তারক বাদ পড়লে অরুণাভেরই টিমে আসার কথা। উইকেট ছেড়ে আসার আগে তারক পীচের উপর ঝুঁকে সত্যি সত্যিই একটা মটর দানার মত কাঁকর দেখতে পায়। সেটা খুঁটে তুলে নিয়ে প্যাভলিয়ানে ফিরে আসতে আসতে তার মনে হয়েছিল—যদি আগেই এটাকে তুলে ফেলে দিতাম। আমার দ্বিধা-ই আমার সর্বনাশের কারণ হল। আর বোধহয় আমি টিমে আসতে পারলাম না।

দ্বিতীয় ইনিংস আর খেলা হয়নি। তবে মরীয়া হয়ে ফিল্ড করেছিল তারক। একটি রান আউট ও দুটি ক্যাচ ধরে সে স্থান পেল দ্বাদশব্যক্তি রূপে।

"বলটা শ্যুট না করলে, মনে হয় তুই টিমে চলে আসতিস।" প্রণব এত বছর পর সান্ত্বনা দিচ্ছে, এতে তারক মনেমনে কুঁকড়ে গেলেও, ভেবে বিস্মিত হল, ব্যর্থতার এই দৃশ্যটি প্রণব মনে রেখেছে ঠিকই।

"বলা শক্ত, অরুণ মিত্তিরের ক্যাণ্ডিডেট ছিল অরুণাভ। ট্রায়ালে ও ফিফটিএইট করে সিলেকশান পায়।"

"যা বোলিং ছিল, তুই সেঞ্চুরি করতে পারতিস।"

"বরাত। নয়তো ইডেনের পীচে কাঁকর থাকবে কেন।"

"অরুণ মিত্তিরতো তোকেও ব্যাক করেছিল।"

"কিন্তু অরুণাভ ওকে মদ খাওয়াত, বাড়িতে চাকরের মত পড়ে থাকত, শুনেছি অরুণাভ যাকে বিয়ে করেছে সে নাকি অরুণ মিত্তিরের কেপ্টের মেয়ে।"

তারক হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকল। প্রণব শুনতে শুনতে আবার জানলার বাইরে উদাসীন ভঙ্গিতে চোখ ফেরাল।

"ভেবেছিলুম আমাদের মধ্যে তুইই সব থেকে বেশি নাম করবি।"

তারক নিজের জন্য দুঃখে এবং অনুতাপে পীড়িত হয়ে নিরুপায়ের মত চোখ নামিয়ে দেখল প্রণবের চেয়ারের তলায় একটা আলপিন পড়ে রয়েছে। সে ভাবল, ওটা খুঁটে তুলে নেবে কিনা। তুলে না নিলে কারুর, বিশেষতঃ প্রণবের, কোন সর্বনাশ ঘটতে পারে এমন কথা তার মনে হল না। তবে ওটা যেমন আছে থাক্, এই সিদ্ধান্তে এসে তারক বলল, "পরিমলতো নাম করেছে।"

"হ্যাঁ। তবে যাদের মধ্যে ও পরিচিত তারা পাবলিক নয়। খুবই সীমিত গণ্ডিতে পরিমলের খ্যাতি। ভাবছি একটা কিছু করা দরকার।"

"কার জন্য ?"

প্রণব গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তারকের আফশোষ হল আবার নিজের জন্য। পাবলিকের মধ্যে পরিচিতি থাকলে প্রণব এখন তার জন্য এর থেকেও বেশি চিন্তায় ডুব দিত। মৃত পরিমলকে হঠাৎ তার, একটা কাঁকর মনে হতে লাগল। প্রণবের

মন থেকে খুঁটে ফেলে দিতে না পারলে, ওর ভাবনা তারকের সমস্যাকে কিছুতেই স্পর্শ করবে না। ছিটকে ছিটকে সরে যাবে।

"ইলার জন্য সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। বেচারা, মাত্র কুড়ি বছর বয়স।" তারক গভীর দুঃখ কণ্ঠে প্রকাশ করার চেষ্টায় নাটকীয় ভঙ্গিতে মুঠো করে চুল টেনে ধরল। "মেয়েটা মারা যাবে ভাবতে পারছি না!"

"পরিমলের বৌ আর ছেলে যে কি করে বাঁচবে এবার······কিছু একটা করা দরকার।"

"তুই একা আর কি করে বাঁচাবি। তাহলে মাসেমাসে তোকে সাহায্য করতে হবে যতদিন না ছেলেটা মানুষ হয়ে রোজগার করছে। তা কি সম্ভব?"

প্রণব সচকিত হয়ে বলল, "সেরকম কিছু করার কথা ভাবছি না। তাহলেও, এই রকম একটা পরিস্থিতির কথা ভাবলে কিছু একটা করতে ইচ্ছে করেতো।"

"নিশ্চয়, খুবই স্বাভাবিক। তানাহলে আমরা মানুষ কেন! ইলার জন্য আমার তাহলে মাথাব্যথা হবে কেন, তুইই বা ডাক্তারের কাছে যেতে রাজী হলি কেন? মানুষ বলেই তো?"

প্রণবের মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল। তারকের মনে হল, ওর ভাল লাগছে কথাগুলো। মানুষকে মানুষ বললে মানুষ খুশি হয়, এটা সে জানত। এতক্ষণ শব্দটা কাজে না লাগানোর জন্য আফশোষ হল তার। দ্বিগুণ উৎসাহে সে বলল, "তুই ভাল করেই জানিস, ইলাকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচবার একটা পথই খোলা আছে। তুই পারিস সেই পথে সাহায্য করতে। তুই মানুষ, কিছুতেই পারবি না একটা মেয়ের মৃত্যু ঘটাতে।"

"আমি মৃত্যু ঘটাব?"

প্রণব সিধে হয়ে বসল। তারক অপ্রতিভ বোধ করল।

“এক্ষেত্রে, সাহায্য না করা মানেই তো মৃত্যু ঘটতে দেওয়া। তোকে বললুম না, ইলা আত্মহত্যা করতে চাইছে।”

“কিন্তু ও আত্মহত্যা করলে কেউ কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?”

তারক চট করে জবাব দিতে পারল না। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, “কিন্তু ও বেঁচে থাকলে, হয়তো পরে কেউ লাভবান হতে পারে।”

“এটা অনুমান।”

“তাই থেকেই সিদ্ধান্তে আসতে হয়।”

“কিসের ভিত্তিতে এই অনুমান? যে আত্মহত্যা করতে চায় তারতো কলকব্জা সব ঢিলে হয়ে গেছে। তাছাড়া এই ব্যাপারটা অর্থাৎ কুমারী অবস্থায় প্রেগন্যান্ট হওয়া, এটা তো কোনদিনই তোর মাসতুতো বোন ভুলতে পারবে না। ব্যাপারটা ওকে তাড়া করবে সব সময়। সুতরাং কলকব্জা ওর ঢিলেই থেকে যাবে। তার থেকে বরং—”

তারক টান হয়ে বসল। প্রণব আর কথা না বলে উদাস হয়ে গেল। যদি প্রণব ভয়ঙ্কর ধরণের কিছু একটা বলে বসে, এই ভয়ে তারক উঠে দাঁড়াল।

“অফিস যেতে হবে, আজ চলিরে। কাল মিটিংয়ে দেখা হচ্ছে। তুই ইতিমধ্যে তাহলে ডাক্তার ফিরেছে কিনা খোঁজ নিয়ে রাখিস।”

বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে তারক দেখল প্রায় সাড়ে আটটা। এখুনি ইঞ্জেকসান নিতে হবে। দ্রুত হেঁটে সে গাল তোবড়ান লোকটার ওষুধের দোকানে ঢুকে বলল, “পেনিসিলিন ইঞ্জেকসান দিতে পারবেন, পাঁচ লাখ?”

“বসুন।”

গাল তোবড়ান আর একটিও কথা বলেনি। তারক ভেবেছিল বেঞ্চে শুতে বলবে। কিন্তু বেঞ্চটা রাস্তা থেকে দেখা যায়। চেনা কেউ দেখতে পেলে হয়তো কৌতূহলে দাঁড়িয়ে যাবে। তাই

কোন কথা বলবার আগেই সে বাঁ হাতের জামার হাতা গুটিয়ে বলল, 'বসে বসেই নিচ্ছি, পাঁচ লাখতো মোটে, কিস্সু হবে না।"

গাল তোবড়ান শুধু ঘাড় নাড়ল। ইঞ্জেকসান নেওয়া সারা হতে মিনিট দশেক লাগল। তারমধ্যে তারক ভেবে নিল,—দুপুরে গুহ ফোন করবে আর বিকেলে ময়দানে মিছিলের সঙ্গে যেতে হবে। না গেলে হিরন্ময় জানতে পারবেই। সব ডিপার্টমেণ্টে ওর চর আছে। তারপর কোনমুখে ওকে নারাণের জন্য অনুরোধ করা সম্ভব। প্রণব ব্যবস্থা করে দেবে কিনা বোঝা গেল না। মনটা সত্যিই ওর খারাপ হয়ে গেছে পরিমলের মৃত্যু সংবাদে। তবে এই মন-খারাপ কালও যেন না থাকে! মন খারাপ হয়ে অবশ্য ভালই হয়েছে। তাজা মন খুব কৌতুহলী হয়। যদি বলত, চল্ তোর মেসোর সঙ্গে আগে দেখা করি, তাহলে আবার ব্যাপারটা ম্যানেজ করার জন্য কিছু একটা বলতে হত। হলনা, এইটাই আপাততঃ স্বস্তিকর।

টুলে বসে বঙ্কুবিহারী মিস্ত্রি খাটাচ্ছে। তারক কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেল। বঙ্কুবিহারী ডাকল। বৈঠকখানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "কালকের মেয়েটি এসে বসে আছে অনেকক্ষণ।"

অনীতা! তারক মোটেই প্রস্তুত নয় এই সময়ে ওর আসায়। কি দরকার? বঙ্কুবিহারীকে বিরক্ত ও সন্দিহান চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে মুখখানি ব্যাজার করে বোঝাতে চাইল, সেও খুব বিরক্ত হয়েছে।

"বস বস। কি ব্যাপার, গুহ কোথায়?"

"আমি একা এসেছি।" অনীতা চাপা গলায় বলল। তারক লক্ষ্য করল ওর চোখ দুটো ফোলা। বোধ হয় রাতে একদমই ঘুমোয় নি। শাড়িটা ঘরে কাচা, ইস্ত্রি হয়নি, শরীরে লেপ্টে। মনে

হচ্ছে বাঁখারির ফ্রেমে কাপড় জড়ানো। তারকের ইচ্ছে করছে না ওর দিকে তাকাতে।

"এই সময়? এখনই তো অফিস বেরোব।"

"আপনাকে একটা কথা বলব বলে এসেছি। ডাক্তারের কাছে আপনি যাবেন না।"

"কেন?" বলে তারক প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু বঙ্কুবিহারীর কান যে এদিকেই পাতা, তাতেও সে নিঃসন্দিগ্ধ।

"তবে যে কাল এত কথা হল গুহর সঙ্গে! ব্যাপারটা কি?"

"আমার ভাল লাগছে না, মানে, কি রকম যেন মনে হচ্ছে।" অনীতা গুছিয়ে বলার জন্য দু'হাতের আঙ্গুলগুলো জড়াল। তারক লক্ষ্য করল তিন চারটে শিরা আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত ফুলে উঠে চুপসে গেল। "আপনি বরং ওকে বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলুন।"

"সে তো বলেই ছিলুম। কিন্তু ও চায় আগে এই ব্যাপারটা সেরে নিতে। বিয়ে হলে তো এ সবের দরকার নেই। আমিও অহেতুক একটা বাজে ব্যাপার থেকে মুক্ত হতাম।"

"না না আপনি ওকে আগে বিয়ের জন্যই বলুন।"

"তুমি তো বলতে পার?"

"বলেছিলুম। আপনাকে যা বলেছে তাই বলল।"

"তাহলে আমি বললে আর কি হবে। ওতো ছোটছেলে নয়, তাছাড়া আমি ওর গার্জেনও নই।"

"কিন্তু ওর কারণগুলো কি নেহাতই বাজে নয়। বহু মেয়েরই তো প্রিম্যাচুওর ডেলিভারি হয় তাই নিয়ে কি কলঙ্ক রটে? তাছাড়া এতো ওরই বাচ্চা, অন্যের তো নয়?"

তারক মনোযোগ করে অনীতার মুখখানি দেখছিল। বাইরে বঙ্কুবিহারীর চড়া গলা শুনতে পেল, "দেবু কটা বাজে, অফিস টফিস কি আজ বন্ধ?"

"আচ্ছা পরে কথা হবেখন। দুপুরে গুহ টেলিফোন করবে, তখন তো এসব কথা বলা যাবে না। রাতে ওকে আসতে বলব। তোমার সঙ্গে আজ দেখা হবে?"

"গিয়ে দেখা করতে পারি, কিছু বলতে হবে?"

"না থাক।"

"আপনাকে কিন্তু এইটুকু করতেই হবে তারকদা, ছোট বোনের মুখ চেয়েও অন্তত করুন। ওতো রেজিস্ট্রি বিয়েও করে রাখতে পারে, তাহলে স্বচ্ছন্দে আমি সব কিছু করতে রাজি আছি।"

চান-খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তারকের মনে হতে লাগল, আবার একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছি। গুহ যদি আগে বিয়ে না করতে চায়, তবে আমাকে কি ওর সঙ্গে লেগে থেকে বোঝাতে হবে এই মেয়েটা চায় আগে বিয়ে হোক। দুজনেই যদি গোঁ ধরে বসে তাহলে আমার ভূমিকা কি হবে? অবশ্য ওরা আমার কেউ নয়। ওদের বাঁচা-মরায় আমার কোন লাভ লোকসান নেই। ওরা এটা জানে। তবু আমাকেই ওরা মাঝখানে রাখতে চায়। কি ভেবেছে যে ওরা আমাকে। আমার নিজের যে দুবেলা ইঞ্জেকসান নেওয়ার এত বড় একটা সমস্যা রয়েছে!

ঠিক হাঁটা বলা চলে না, ওয়াকিং রেসের প্রতিযোগীর মত তারক ট্রাম স্টপে হাজির হল। কালকের সেই স্ত্রীলোকটি ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে। ওকে দেখেই তারক কুঁকড়ে গেল। তার মনে হল, হয়তো ভাবতে পারে কাল গায়ে হাত-টাত দিয়ে লোকটার লোভ ধরে গেছে। আজও ঠিক পিছু পিছু হাজির হয়েছে।

ট্রাম আসতে স্ত্রীলোকটি এগিয়ে গেল এবং উঠল। তারক ক' মিনিট লেট হবে হিসেব করে, পরের ট্রামের জন্য অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়ে নিজেকেই বলল,—এ হচ্ছে এক ধরনের রোগ। ছেঁদা-গুলো বন্ধ না করলে সারান যাবে না। মেয়েটা আমার সম্পর্কে

হয়তো ভাল-মন্দ কিছুই ভাবেনি। প্রায়ই হয়তো কেউ না কেউ ওকে কোমর ধরে পতন থেকে রক্ষা করে। হয়তো ভুলেই গেছে আমার চেহারাটা। আর আমি নিজেকে অপরাধী বানিয়ে অফিস লেট করে মুখ লুকোচ্ছি। আমি কে, যে অন্যে আমাকেই ভাবছে মনে হয়? আসলে তো লক্ষ লক্ষেরই একজন।

॥ ছয় ॥

"জিততে হলে ঐক্য চাই !"

"ঐক্য চাই ঐক্য চাই।"

"বাঁচতে হলে লড়তে হবে।"

"লড়াই করে বাঁচতে হবে।"

"লাইন ভেঙ্গে কাউকে যেতে দেবেন না তারকবাবু।"

"কি করব জোর করে যে চলে যাচ্ছে।" অসহায় সুরে তারক বলল।

পিছন থেকে পূর্ণ দপ্তরী পিঠে চাপ দিল—"ঘন হয়ে থাকুন, আপনি বড্ড ফাঁক রাখছেন।"

তারক লম্বা পায়ে এগোতে গিয়ে নিখিল চাটুজ্যের গোড়ালিতে ঠোক্কর দিল। বুড়ো মানুষ, অল্পদিনই আর চাকরীতে আছেন। তারক খুবই লজ্জা পেয়ে ঝুঁকে বলল, "লাগল আপনার ?"

বৃদ্ধ ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল কথাটা কে বলল। তারপর মাথা নাড়ল। তারক সকলের পা ফেলার তালটা ধরার চেষ্টা শুরু করল। আর মাঝে মাঝে মিছিলের মাথার দিকে তাকিয়ে হিরণ্ময়কে লক্ষ্য করে চলল। নানান অফিসের মিছিল, একটির পিছনে আর একটি জুড়ে জুড়ে কত বড় যে হয়ে গেল তারক আর ঠাওর করতে পারছে না। লাল সালুর ফেস্টুনগুলো আড়াল করে আছে সামনেটা। তারকের ইচ্ছে হল, চট্ করে লাইন থেকে বেরিয়ে একবার দেখে নেয়, পাশ থেকে মিছিলটাকে কেমন দেখাচ্ছে। কিন্তু সেটা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ হতে পারে ভেবে নিরস্ত রইল।

"আপনি কি আজই প্রথম মিছিলে যোগ দিলেন?" নিখিল চাটুজ্যে মুখটা পাশে ফিরিয়ে কিন্তু সামনে চোখ রেখে বলল।

"হ্যাঁ।"

"আমি প্রথম মিছিলে বেরোই থার্টি টু-এ, রঙপুরে। এই যে কনুইটা বাঁকা দেখছেন, পুলিশের লাঠিতে।"

তারক ভাবল, 'আহা' বলা উচিত। কিন্তু সেটা যেন খুবই শস্তা হয়ে যায়। চোখ মুখে শ্রদ্ধা ফোটালেও তো দেখতে পাবে না। হাত বাড়িয়ে সে কনুইটাকে ছুঁতে পারে। কিন্তু অল্পবয়সী হলেই অবশ্য সেটা সম্ভব, এই বৃদ্ধের গায়ে হাত দিয়ে তারিফ জানানোটা বেমানান হবে।

"তারকবাবু, শুনছি নাকি ওই পাওনা টাকাটার দশ পারসেন্ট ইউনিয়নকে চাঁদা দিতে হবে।"

"কই শুনিনি তো!"

"হ্যাঁ, কালইতো শুনলুম অনেকে বলাবলি করছে। তাহলে তো আমাকে তেতাল্লিশ টাকা প্রায় চাঁদা দিতে হবে।"

তারক হিসেব করে দেখল, তাকে দিতে হবে আট টাকা। "ইউনিয়নের জন্যই তো এতগুলো টাকা পাচ্ছ, মাইনে বাড়ছে, দিলেই না হয়, একবারই তো।"

বিড়বিড় করে পূর্ণ কি যেন বলল, তারক বুঝতে পারল না। বিমল মান্না শ্লোগান দিচ্ছে দুটো সারির মাঝে পিছু হটে চলতে চলতে, মুখের পাশে টার্জানের মত হাত রেখে চীৎকার করে। তারকের খেয়াল হল, বহুক্ষণ সে গলা দেয়নি। হিরণ্ময়ের খুব কাছের লোক বিমল মান্না। অন্তত এটুকুও যদি বলে—তারক সিঙ্গি খুব গলা দিচ্ছিল দেখলুম।

"রেশন কোটা বাড়াতে হবে।"

"রেশনের দাম কমাতে হবে।"

"মূল্য বৃদ্ধি রোধ কর।"

"দ্রব্যমূল্য হ্রাস কর।"

"দেশের শত্রু জোতদার।"

"চোরাকারবারি মজুতদার।"

বিমল মান্না দেখছে। তারক ভাবল, যাক কাজ অনেকখানি হয়ে রইল। মিছিল সাজাবার সময় হিরণ্ময় দেখেছে, হেসেও ছিল। কালকেই ওকে নারাণের জন্য বলা যেতে পারে একবার তো শুধু এ জি এম-কে বলা—আমার লোক। চাকরী দেওয়ার অনুরোধ নয়। বাকিটা নারানের ভাগ্য।

লালবাজার পার হয়ে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ধরে মিছিল চলেছে। তারক দেখল দুধারের ফুটপাথে লোকেরা বিরক্ত মুখে তাকিয়ে। বহু মুখ দেখে তার মনে হচ্ছে কাল কি পরশুর কোন মিছিলে ওরা ছিল। এইভাবে শ্লোগান দিতে দিতে ময়দান কি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গেছে। আটকা পড়া ট্রাম-বাসের লোকেদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলছে—আধঘণ্টার কম নয় দাদা, বিরাট লম্বা মিছিল। ভেদ করে কেউ রাস্তা পার হবার চেষ্টা করলে হৈ হৈ করে হয়তো ঠেলে দিয়েছে। বারো চোদ্দ বছর আগে একবার চাষীদের একটা মিছিলের মধ্য দিয়ে তারক রাস্তা পার হয়েছিল। লুঙ্গিপরা মাঝবয়সী একজনকে গায়ে হাত দিয়ে বলে—কত্তা, ওপারে যাব? লোকটি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে বলে—যায়েন!

চলতে চলতে তারকের বিরক্ত লাগল। ভেবেছিল অদ্ভুত কিছু লাগবে। যেমন ম্যাচের দিন ব্যাট হাতে নামার সময় যে শিরশিরানি পেটের মধ্যে হত বা ফাঁকা মাঠে বাউণ্ডারীর ধারে দুটো লোকও বসে থাকলে যে রকম ভয়-ভয় করত, সেই রকমের কোন অনুভূতি। এখন সে দেখছে দুধারের দৃশ্য খুবই গতানুগতিক। যেসব লোক দাঁড়িয়ে বা চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে

তাদের কারুর চোখে তারিফ বা সমীহ নেই। যেন বলতে চায়, খুটখাট করে আর কি হবে, তাড়াতাড়ি আউট হয়ে ফিরে এসো। এখন ফুটপাথের লোকেদের ইতর বলে তার মনে হচ্ছে।

অথচ বহুবার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখতে দেখতে তার মনে হয়েছে, লোকগুলোর আস্ত নিজস্ব ঘুমোবার ঘর নেই, বুদ্ধিমতী বৌ বা স্বাস্থ্যবতী প্রেমিকা নেই, কৌতুহলী ছেলেমেয়ে বা সহৃদয় বাবা নেই, ওদের ঘরে একটার বেশী জানলা নেই, বন্ধুরা আড্ডা দিতে আসে না। পরদিন অফিস যাওয়ার আগে পর্যন্ত ওরা, সম্ভবত এইভাবে মিছিল করে সময় কাটাতে পারে। ওদের বোধহয় বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। নিষ্প্রাণ উইকেটে যেন ঠিকিয়ে ঠিকিয়ে তিনশো-চারশো রান করে চলেছে। কোনক্রমে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকাই যেন উদ্দেশ্য।

হঠাৎ চমকে উঠল তারক। অরুণ মিত্তির না? সাদা ফিয়াটে অফিস থেকেই বোধ হয় বাড়ি ফিরছে। মিছিলের জন্য আটকে পড়ে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে, ভ্রু কুঁচকে মিছিলের দিকে তাকিয়ে। তারক রুমাল বার করে মুখ মুছতে শুরু করল যেন না চিনতে পারে। নিখিল চাটুজ্যের কানের কাছে মুখটা ঝুঁকিয়ে দিল যাতে আড়াল পড়ে।

"আপনার তো এপ্রিলে রিটায়ারমেণ্ট, ওরা কিছু বলল-টলল?"

"এক্সটেনশন? নাঃ, ধরাধরি করতে আমার ভাল লাগে না।"

"আপনার ছেলেরা এখন কি করে?"

"ছেচল্লিশের দাঙ্গাতেই সব শেষ হয়ে গেছে।"

তারক মুখ টেনে নিয়ে অরুণ মিত্তিরের সাদা গাড়িটাকে আড়-চোখে দেখল। পিছনের জানলা দিয়ে কতকগুলো প্যাকেট আর বই ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। এই লোকটাই বলেছিল,

তোকে টিমে আনবই। সিলেকশন মিটিং-এ আমি লড়ব তোর জন্য। ওর রক্ষিতার মেয়েকে বিয়ে করলে নিশ্চয় এসে যেতাম।

একসময় মিছিলটা মনুমেন্টের তলায় পৌঁছল। মিটিং করে করে ঘাস উঠে গেছে। তারক রুমাল বিছিয়ে বসে সামনে তাকাল। দোতলা সমান উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে একটা লোক বক্তৃতা করে চলেছে। তারকের মনে হল এ সবই তার বহু বছর আগেই শোনা আছে। মাঠ থেকে ফেরার পথে চানা-মটর খেতে খেতে বট গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে খানিক রোমাঞ্চিত হবার জন্য প্রায়ই শুনত। সেইসব কথা, ঠিক সেই গলায়ই লোকটা বলছে একই সুরে একই ভঙ্গিতে। তফাতের মধ্যে এই লোকটা নতুন।

এখানে একবার দেখা হয়েছিল সরোজদার সঙ্গে। পাড়াতেই ভাড়া থাকতেন, বিয়ে করেননি। একদিন শেষ রাতে বাড়ি ঘেরাও করে পুলিশ সার্চ করে ছিল ওর ঘর। ওর বোন প্রীতিদি পার্টি করত, গ্রামে গ্রামে ঘুরে থিয়েটার করত, থলি হাতে বাজারে যেত, ছেলেদের সঙ্গে হা হা করে হাসত। তাই নিয়ে পাড়ায় অনেকে আপত্তি তুলেছিল। সরোজদা ইংরিজি আর অঙ্ক পড়াতেন, টাকা নিতেন না। ওঁর বাড়িতে গিয়ে পড়তে হত। হরদম বিড়ি খেতেন, ইংরিজি ডিটেকটিভ বই পড়তেন আর কথায় কথায় বলতেন, এ দেশে বিপ্লব হওয়া বড় কঠিন। মা প্রায়ই রান্না পাঠিয়ে দিত। এখানে সরোজদার সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, মা কেমন আছেন। তারপর বলেছিলেন, কাগজে মাঝে মাঝে তোমার নাম দেখি। এবারে তো দুটো সেঞ্চুরি করেছ, আর হচ্ছে না কেন? খুব ভাল করে খেলো। পরে যেন বলতে পারি ঐ যে টি, সিনহাকে দেখছ, ওকে আমি ইংরিজি পড়াতাম। বলতে পারব তো?

সরোজদা মোটেই ঠাট্টা করে বলছিলেন না। জবাব না দিয়ে

মাথা নুইয়ে হেসেছিলাম। তখন লজ্জা পাওয়ার মধ্যে আমেজ লাগত। জেগে জেগেই তখন দেখতাম লর্ডসে মেল্বোবার্ণে, কিংষ্টনে ছাতু করছি বোলারদের। তখনো জানতাম না, একটা কাঁকর আমায় চুরমার করে দিয়ে যাবে। দ্বাদশব্যক্তি হয়ে ফিল্ডিং দিতে নেমে আমারই ফেলে দেওয়া ক্যাচ বাংলাকে হারাবে আর তার ফলেই চিরকালের মত বাদ পড়ে যাব। কাগজে লিখেছিল, সিনহার ফিল্ডিং দেখে মনে হচ্ছিল বড় ম্যাচ খেলার নার্ভ এখনও তার তৈরী হয়নি। অথচ খেলা শুরুর দিন সকালে বারবার মনে হয়েছিল—অরুণাভর যদি এখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়! যদি পিছলে পড়ে প মুচকে যায় কি হাত ভাঙ্গে তাহলে আমি ওর জায়গায় টিমে এসে যাব। টিমের নাম সাব্‌মিট করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিলাম, কিছু একটা ঘটবে। আমি টিমে আসব। কিন্তু কিছুই ঘটল না। শুধু লজ্জা পেয়েছিলাম মনে মনে, অরুণাভ-র অ্যাকসিডেন্ট কামনা করার জন্য।

দ্বাদশব্যক্তি হয়ে আমার চরিত্রে একটা নতুন ছেঁদা দেখতে পেলাম। সেটা বুঁজে গেছে কি বড় হয়েছে, বুঝতে পারছি না।

তারকের শরীর একবার কেঁপে উঠল। মাথার মধ্যেটা ঝনঝন করছে। ঠিক সেদিনকার মত সেই গলায়, সেই সব কথা দিয়েই লোকটা কিংবা আর একটা লোক বক্তৃতা করছে। তারকের মনে হতে লাগল, এই জায়গাটা বিন্দুমাত্রও বদলায়নি। বটগাছ মনুমেন্ট, শ্লোগান, চানা-মটরওলা, লাল ফেস্টুন, পোষ্টার সবই হুবহু সেদিনকার মত। এক্ষুনি হয়তো সরোজদা এসে বলবেন, যেন বলতে পারি ওই যে—

তারক মাথা নিচু করে বসে রইল। সরোজদা যেন না দেখতে পান।

তখন ওর মনে পড়ল ইঞ্জেকসান নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। ভীড় ঠেলে মিটিং থেকে বেরিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে সে বাসে উঠল।

বাস থেকে নেমে তারক হনহনিয়ে ডাক্তারখানায় এল। কিছু রোগী নিয়ে ডাক্তার বসে। যুবকটি কাঁচমাচু হয়ে ডাক্তারকে বলল, "উনি ইঞ্জেকসান নিচ্ছেন।"

"তোমায় বারণ করেছি আমি না থাকলে কাউকে ইঞ্জেকসান করবে না। বিপদ ঘটলে কে দেখবে?"

"অন্য কিছু নয়, পেনিসিলিন।"

ডাক্তার গোমড়ামুখে রোগীদের দিকে মন দিল। কাত হয়ে ইঁট বার করা দেয়াল দেখতে দেখতে তারকের মনে হল, এখন যদি মরে যাই! কিছুক্ষণ তার খুব ভয় করল।

বাড়ি এসে শুনল গুহ এসেছিল। বলে গেছে, ঘুরে আসছি। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে রইল সে। অনেক কথা, অনেক ঘটনা তালগোল পাকিয়ে মনে পড়ছে তার, এর মাঝে অনীতার কথাই বেশী করে তার মন জুড়ে ছেয়ে গেল। তারক ঠিক করল, গুহকে আগে বিয়ে করতে বলবে। দরকার হলে ভয় দেখাবে, অফিসে রটিয়ে দেব। মেয়েটা যা বলল, রেজিষ্ট্রি বিয়েও তো করে রাখা যায়। তাহলে কারুর মনই আর খচ্‌খচ্‌ করবেনা। বাড়ির আপত্তি আর কদিন টিঁকবে, তাদেরও তো বংশের বা ছেলের মানমর্যাদার কথা ভাবতে হবে। সে সব ব্যাপার নয় বুঝিয়ে বলা যাবে গুহর বাবাকে।

তন্দ্রা এসেছিল, বঙ্কুবিহারীর ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠল।

"সেই ছেলেটা আবার এসেছে। কি ব্যাপার বলতো?"

"কি আবার ব্যাপার!"

"ও তখন জিজ্ঞেস করল আমায়, কোন মেয়ে তোর কাছে

সকালে এসেছিল কিনা। এসেছিল বলতেই এমন একখানা ভাব করল। কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?”

“না, গোলমাল আর কি।” তারক হেলফেলার ভাব দেখাল। “যা হয় আর কি। বিয়েতে বাড়ির সবাই আপত্তি করছে, আমাকে ধরেছে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে।”

“ছেলের বাড়িতে আপত্তি তো হবেই, যা পেত্নীর মত দেখতে। অবস্থাও তো মনে হয় ভাল না। তুই কিন্তু বেশী জড়াসনি। শেষে থানা-পুলিশ কোর্ট-ঘর না করতে হয়।”

“আজকালতো আর অবস্থা দেখে, রূপ দেখে ছেলেরা বিয়ে করে না। প্রথমেই দেখে শিক্ষা-দীক্ষা।”

“তাই নাকি!” বঙ্কুবিহারী অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, “তুই তাহলে কোন্ কালের ছেলে? দেখতে ভাল নয় বলে চারটে মেয়ে বাতিল করে, তিন হাজার টাকা নগদ পণ নিয়ে তবে তুই বিয়ে করেছিস্।”

“টাকা আমি নিইনি। ও টাকার এক পয়সাও আমার হাতে আসেনি। টাকা আমি নিতেও বলিনি।” উত্তেজিত স্বরে তারক বলল।

“টাকা না নিলে বিয়ের খরচ, বৌভাতের খরচ আসত কোত্থেকে? তাহলে আজকালকার যা ফ্যাসান, সই মেরে বিয়ে করলি না কেন? দু-চারটে বন্ধুকে ডেকে রেষ্টুরেণ্টে খাইয়ে দিলেই বৌভাত চুকে যেত।”

বঙ্কুবিহারী ঠোঁট মুচড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারক তখন মনে মনে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, রেজিষ্ট্রি বিয়ে করলে তুমি আমাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিতে। ঘর ভাড়া করে সংসার পাতার সামর্থ আমার নেই। তাছাড়া এভাবে কাকেই বা বিয়ে করব। আমার সঙ্গে কোন মেয়ের প্রেম হয়নি। গৌরীর

সঙ্গে যা কিছু হয়েছিল তাকে প্রেম বলা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে। চারটে মেয়ে অপছন্দ করেছি কেননা তারা গৌরীর থেকে রূপে নীরেস ছিল। এটা আমার দুর্বলতাই। তখন ইচ্ছে হয়েছিল সুন্দরী বউ নিয়ে একবার গৌরীকে দেখিয়ে আসব। বুঝিয়ে দেব, আমিও নেহাত হেঁজিপেজি নই, দুনিয়ায় তুমিই একমাত্র সুন্দরী নও। কিন্তু রেনু এত অমার্জিত নির্বোধ হবে ভাবিনি। কি প্রচণ্ড যে ঠকেছি। ওর বাবার পয়সা আছে ওর শরীরে প্রচুর মাংস আছে। তাই নিয়ে গগন বসুমল্লিকের মেয়ের সামনে দাঁড়ান যায় না। বরং অনীতার মত কুরূপা জিরজিরে মেয়েকেও গৌরীর সামনে রাখা যায়। একটা বড় ধরণের বোকামি করে ফেলেছে বটে কিন্তু ও ক্লান্তিকর নয়। মাংস খেয়ে খেয়ে পেট খারাপ হওয়া লোককে লুব্ধ করার মত কিছু কিছু ব্যাপার এই শুকনো ডাঁটার মত মেয়েটার মধ্যে আছে বৈকি।

তারক একতলায় নেমে আসতেই ব্যগ্রকণ্ঠে সলিল বলল, "গেছলেন ?"

"কোথায় ?"

"ডাক্তারের কাছে।"

"বলছি, বাইরে চল।"

আর কথা না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'জন পার্কে এসে বসল।

"বিয়ে করবে না কেন ?" তারক অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করল। সলিলের মুখ দেখে সে স্পষ্টই বুঝল প্রশ্নটা আশা করেনি। "কালকেই চল ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিসে।"

সলিল এতক্ষণে নিজেকে আয়ত্ত করে ফেলেছে। অনুত্তেজিত স্বরে বলল, "হয় না। ও এখনো মাইনর, কুড়ি বছর বয়স হয়নি।"

তারকের মাথা গরম হতে শুরু করল সলিলের হিসেব-কষা

উত্তরে। বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলল, মাইনরের বিয়ে হয় না সে খবরটাতো জানো দেখছি, মাইনর কুমারীর পেট করতে নেই সেটা বুঝি জানো না! এই সব ছেলেকে চাবকে সিধে করতে হয়।

"তা নিয়ে ভাবতে হবে না। টাকা ঢাললেই মাইনরকে মেজর করে দেওয়া যায়।"

"অনীতা বুঝি সকালে এসেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"দুপুরে গেছল আমার কাছে, কান্নাকাটি করল খানিকক্ষণ। ও আগে বিয়ে করতে চায়।"

"সেটাই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া ব্যাপার যা করেছ, তাতে ওর নার্ভাস হয়ে পড়াটাও অন্যায় নয়। হাজার হোক মেয়ে তো। করে ফেল। বিয়ে তুমি তো করবেই, নয় আগেই করলে।"

সলিল মুখ ফিরিয়ে পার্কের মধ্যে লোকেদের শোয়া-বসা-চলা কিংবা বাইরের রাস্তায় মোটরের যাতায়াত দেখতে লাগল। কথা গায়েই মাখল না। তারক লক্ষ্য করতে লাগল ওর চোখে কি ধরনের ভাব ফোটে। মনে হল প্রণবের—"পরিমল মারা গেছে জানিস," বা নিখিল চাটুজ্যের—"থার্টিটুতে প্রথম মিছিলে যোগ দিই," বলার সময় চোখ দুটোর যে অবস্থা ওরা করেছিল অনেকটা সেই রকম ভাব ফুটে উঠল। কিন্তু গুহর রগের কাছটা হঠাৎ দপদপাল কেন? ভদ্র, মর্জিত এবং সদা স্তিমিত গুহর মুখে চাষাড়ে রাগও অপ্রত্যাশিত!

"কিছু যদি মনে না করো, একটা কথা বলব গুহ?"

"বলুন।"

"তোমার কি অনীতাকে বিয়ে করার ইচ্ছে নেই?"

"ও-কথা বলছেন কেন?"

"কেমন যেন মনে হচ্ছে।"

সলিল আবার শোয়া-বসা-চলা বা যাতায়াত দেখার জন্য মুখ ফেরাতেই তারক বলল, "তাহলে অনীতার এই সর্বনাশ করলে কেন ?"

"আমি করিনি।"

"সে কি ! কে করল !"

সলিল ইতস্তত করে বলল, "আপনি বয়সে বড়, কি করে যে ব্যাপারটা বোঝাব ভেবে পাচ্ছি না। অনীতার যা ঘটেছে সেটা আমার দ্বারাই তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ও এটা চেয়েছিল।" সিধে হয়ে বসে সলিল তার রগের দপদপানিটা গলায় এনে বলল, "অনীতা নিশ্চয় পারত ব্যাপারটা না ঘটাতে। কিন্তু সেই সময় ও আমাকে বাধা দেয়নি। আমার কাছে ব্যাপারটা একদমই নতুন, সিন্‌হাদা আপনি তো বিবাহিত, নিশ্চয়ই বুঝবেন কি রকম উত্তেজনা হয় তখন। বুঝলেন, আমি সামলাতে পারলুম না নিজেকে। ও বহুদিন ধরেই চেষ্টা করছিল আমাকে ফাঁদে ফেলতে, তিল তিল করে দুর্বল করে দিচ্ছে বুঝতে পারছিলুম, কিন্তু কত পারব বলুন। আমি তো একটা মানুষ, কত সামলাবো ?"

সলিলের উত্তেজনা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, তারকের ইচ্ছে করছে ওর গায়ে হাত রাখতে। তার মনে হল ছেলেটা নির্দোষই। এরকম ক্ষেত্রে যে-কেউই ওর মত হয়ে যেত।

"সত্যি বলতে কি, এখন মনে হচ্ছে ওকে মোটেই ভালবাসি না।"

সলিল একমুঠো ঘাস ধরে ছেঁড়ার জন্যে টানতে থাকল। এই সময় রাস্তায় মোটরের ব্রেক কসার শব্দ হল। হৈ হৈ করে কিছু লোক ছুটে গেল। কেউ চাপা পড়েছে কিনা দেখার জন্য তারক ঘাড় ফিরিয়ে গলা লম্বা করে দেখল একটা ভিড় জমেছে। সলিল মুখ নিচু করে ঘাসই ছিঁড়ছে।

"তাহলে তুমি ওর সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করলে কেন ?"

"কি করব।"

অসহায়ভাবে সলিল তাকাল। তারক দেখল একটা লোককে নিয়ে টানাটানি করছে সবাই। বোধ হয় মোটর ড্রাইভার। তাহলে চাপা পড়েছে, সে ভাবল, এবার কি মোটরটায় আগুন ধরবে?

"আমার বয়স মোটে চব্বিশ। অনীতা যেমনই দেখতে হোক, একটা মেয়ে তো। আমি কি করতে পারি?"

"তাহলেও এখন তো তুমি ওকে ত্যাগ করতে পার না, সেটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, হৃদয়হীনের মত কাজ হবে।"

"জানি, হয়তো ওকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে হবে।"

'এত মনমরা হচ্ছো কেন।" তারক দেখল একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আসছে। "মানিয়ে নিয়ে চললে দেখবে আর অসুখী লাগবে না। সংসার, সন্তান হলে পরই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সলিল একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। দু'টো লোককে ভিড় থেকে ফিরতে দেখে তারকের ইচ্ছে করল জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে? মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে মরার মত অ্যাকসিডেণ্ট নয়।

"বাড়িতে আপত্তি করে অনীতার সঙ্গে কথা বললে। ওরা তো জানেই না এখন কি অবস্থায় ব্যাপারটা পৌঁছেছে। জাতের মিল নেই তো বটেই, দেখতে-শুনতে বা ওদের বাড়ির যা অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে কাউকেই রাজি করাতে পারব না। মা তো একদিন স্পষ্টই অনীতাকে বলে দেয়, এত ঘনঘন আসো কেন? আমার জন্য মেয়েও দেখতে শুরু করেছে। এখন যদি জানতে পারে ওরা—" সলিল ছটফট করে একমুঠো ঘাস চেপে ধরল। "কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে কোথাও বাসা করে বিয়ে করব, না দূরে কোথাও পালিয়ে যাব, ভেবে

পাচ্ছি না, আপনি কি বলেন? তারকদা আপনার যদি এমন হত?"

তারক হেসে উঠল। "ওঠো এবার।"

দুজনের আর কথা হল না। পার্ক থেকে বেরিয়ে তারক দেখল জায়গাটা ফাঁকা। একটা লোকের কাছে সে জানতে চাইল শেষ পর্যন্ত কি হল। লোকটা জানাল, বাস ধরার জন্য সে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে, কিছুই জানে না।

ছাড়াছাড়ি হবার আগে সলিল আরো কিছু বলতে চাইল। "জানেন, ও যখন কাঁদছিল আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওর দুই দিদির বিয়ে হয়নি। বাবা সামান্য চাকরী করে, টাকার জোরে বিয়ে দেবে সে অবস্থাও নয়। অনীতারও বিয়ে হবার কোনে উপায় দেখছি না। আপনি কি বলেন, মানিয়ে চলা যাবে?"

শুকনো গলায় তারক বলল, "তোমার ব্যাপার তুমিই ঠিক কর। তবে ডাক্তারের কাছে যাওয়া নিয়ে কাল সন্ধ্যেবেলা কথা বলতে যাব। যদি বিয়ে করবে ঠিক কর, কাল বিকেলের মধ্যেই জানিয়ে দিও, তাহলে আর যাব না।"

"আপনি যদি অনীতাকে একটু বুঝিয়ে বলেন।"

"কি বোঝাব?" তারক বিরক্ত হয়ে গলাটা রুক্ষ করল। "তার বিয়ে হওয়া দরকার আর আমি তাকে বলব বিয়ে করো না? আমার কি অধিকার আছে এ-কথা বলার?"

সলিল হতভম্বের মত তারকের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড! তারপর ধীরে ধীরে কালো হয়ে এল ওর মুখ। বলল "এটা অধিকার থাকা না থাকার প্রশ্ন নয় সিন্‌হাদা। অন্যায় ঘটতে দেখলে মানুষ মাত্রেই তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। আপনি কি মনে করেন না, ওর সঙ্গে বিয়ে হলে একটা অন্যায় ঘটবে? আপনি কি মনে করেন এটা ভালবাসার বিয়ে হবে?"

"আমি যা মনে করি, তা দিয়ে তোমাদের সমস্যার মীমাংসা হওয়া উচিত নয়। আমার বোধ বুদ্ধি, ভাললাগা, মন্দলাগা, রুচি অরুচি, আনন্দ নিরানন্দ, তোমার সঙ্গে মিলবে এমন কোন কথা নেই। তুমি যদি মনে কর অনীতা বিরক্তিকর তাহলে বিয়ে করো না। যদি মনে কর—"

"বলুন ?"

তারক ফাঁপরে পড়ল: তার মনে হচ্ছে, এতক্ষণ ধরে সে শুধু বাজে কথাই বলে চলেছে। আসলে সে এড়িয়ে যেতে চায়। সলিলের সমস্যাটা যেন অফস্টাম্প থেকে আউট সুইং করে বেরিয়ে যাওয়া বল, ব্যাট তুলে রেখে সে নিরাপদ থাকতে চাইছে। কিছু আগে সলিল বলেছিল, আপনার যদি এমন হত ? তার জবাবে সে হেসে উঠে পড়ে, পাছা থেকে ধুলো ঝাড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু মনে মনে তখন থেকেই সে সলিলকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে এই প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার জন্য।

"যদি মনে কর ওকে ভালবাসি, তাহলে বিয়ে করবে—এই কথাই বলবেন তো ?" সলিল স্পষ্টই ব্যঙ্গ করে উঠল।

"হ্যাঁ। তোমার কি মনে হয় একথা বললে খুব অন্যায় বলা হবে ? মানুষ তাহলে কিসের তাগিদে বিয়ে করে। সেক্স ? সে তো জানোয়ারদের ব্যাপার।" কথাটা বলতে পেরে তারক নিখুঁত একটি লেটকাট করার আত্মপ্রসাদ অনুভব করল।

সলিলের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। এল-বি-ডবল্যুর আবেদন করে সে যেন দেখছে আম্পায়ার মাথা নাড়ছে। হতাশ স্বরে সে বলল, "আপনি যে এই কথাই বলবেন, আমি তা আশা করে-ছিলাম। প্রমাণ আপনার হাতেই রয়েছে। কিন্তু ওকে বিয়ে করলে ওরই ক্ষতি হবে। সুখী হবেনা। আমি ওকে সুখী করতে পারব

না। এক্ষেত্রে উচিত নয় কি, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের কাছে না গিয়ে ডাক্তারের কাছেই যাওয়া ?"

"যদি তাই উচিত মনে কর, তাহলে তাই কর। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এসবই তোমার কেটে পড়ার অছিলামাত্র। একটা মেয়েকে তুমি ডুবিয়ে দিতে যাচ্ছ গুহ, এটাই অন্যায়।"

"বিয়ে করলেই অনীতা ভেসে উঠবে, কেমন ? তাহলেই ন্যায় হবে!" সলিল হাঁফ ছাড়া ক্লান্তস্বরে বলল। তর্ক করতে আর যেন ইচ্ছুক নয়। তারকেরও ইচ্ছে করছে না। সারাদিন ধরেই ধকল চলেছে তার। এখন বিছানার জন্য সারা শরীর টনটন করছে।

"থাকগে এসব কথা, আজ আমি ভীষণ টায়ার্ড।"

"আমিও। সারাদিন ধরে আমি একটা ডিসিশ্যন্ নেবার চেষ্টা করেছি, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা না করতে হয়।"

শুনেই খরখর করে উঠল তারকের গায়ের ত্বক। জলতেষ্টা পাচ্ছে মনে হল। শুক্‌নো স্বরে সে বলল, "তোমার কলকব্জাগুলো সব ঢিলে হয়ে গেছে। এবার তুমি অচল একটা যন্ত্রে পরিণত হবে তারপর মরচে ধরবে। কারুর কোন উপকারেই আর আসবে না।"

এই বলে, বেগে স্থানত্যাগ করল তারক। সলিল কতক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকবে ফুটপাথে, তাই নিয়ে সে আর ভাবল না। ট্রাম রাস্তা পার হবার সময় দেখল অহীন তার ডাক্তারখানা থেকে বেরুচ্ছে, হাতে স্টেথো আর ব্যাগ। হয়তো কলে যাচ্ছে। তারককে দেখে অহীন তাকাল এবং ব্যক্তিত্ব আনার জন্য চিবুক ঝুলিয়ে দিল। তারকও যথোচিত ঔদাসীন্য দেখিয়ে ওর পাশ দিয়েই চলে গেল।

তারক ভেবেছিল শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু শোয়া মাত্রই তার মাথার মধ্যে পাক দিতে শুরু করল, একটি কথা—আপনার যদি এমন হত ? কিন্তু সলিলের এই প্রশ্নটা তার কাছে খুবই

অন্যায় বলে মনে হতে লাগল। এ রকম অবস্থায় পড়া আর পড়েছি বলে কল্পনা করার মধ্যে অনেক তফাৎ। এই তফাৎটুকু হাজার যুক্তি দিয়েও জোড়া দেওয়া সম্ভব নয় জেনেও তারক প্রশ্নটার কি উত্তর হতে পারে তাই নিয়ে ভেবে চলল।

ভাবতে ভাবতে তার মনে হল, নিজেকে সলিলের জায়গায় দাঁড় করালে আমার অনীতা তাহলে কে হবে? সঙ্গে সঙ্গে রেনুর মূর্তি ভেসে উঠল তার চোখে। অমনি মাথার মধ্যে ঝনঝনানি শুনতে পেল সে। বালিশটাকে থাবলে ধরে যখন সে বলতে চাইল, সব ছেঁদা বন্ধ করে দেব দেখি তুমি কোনখান দিয়ে ঢুকতে পার, তখন তার মনে হল দুটো উপড়ে নেওয়া চোখ অন্ধকারে তাকে খুঁজছে।

বালিশে মুখ গুঁজে তারক ভাবল, ধরা পড়লে আমাকে শেষ করে দেবে। তার আগেই আমাকে কোথাও পালাতে হবে।

॥ সাত ॥

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তারকের মনে পড়ল একদিন কলেজে ইউনিয়ন রুমের সামনে একটা শ্যামবর্ণ রোগা ছেলে হঠাৎ তাকে বলে, "আপনিই তো তারক সিংহ? এখনো আপনার ছবিটা দিলেন না যে? তাড়াতাড়ি দিন ব্লক করাতে হবে। প্রেসের কাজ তো প্রায় শেষ হয়ে এল। আর শুনুন, ব্লেজারপরা ছবি দেবেন।" আরও কতকগুলো কথা বলেছিল মনে পড়ছে না। ছেলেটা কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক।

তারক ছবিটা দেখতে দেখতে ভাবল, এই তাহলে পরিমল ভট্‌চার্জ্জি। একটা বিধবা, একটা ছেলে আর তিনটে কবিতার বই রেখে মারা গেছে। সেজন্য গোটা চল্লিশ লোক সভা করে শোক জানাচ্ছে। আমি মরে গেলে রেনু ছাড়া আর কেউ কাঁদবে না। ছেলে দুটোর শোক বোঝার বয়সই হয়নি। এই লোকগুলো কি এখন নিজেদের পরিমলের বৌয়ের জায়গায় দাঁড় করিয়েছে?

তারক ঘরের পিছনের দিকে বেঞ্চে বসে লোকেদের লক্ষ্য করতে লাগল। প্রণবকে তার মনে হচ্ছে উদ্যোক্তাদেরই কেউ। কাল বিমল মান্না ঠিক ওর মত হাবভাব করেই ঘোরাফেরা করছিল। একটা টুলের উপর সাদা টেবল ক্লথ বিছিয়ে পরিমলের ফোটোটা রাখা। ফ্রেমটা নতুন। পরিমল খুব হাসছে। দেখে তারকেরও হাসি পেল। পরিমল বোধ হয় ছবিটা তোলার সময়ই টের পেয়েছিল, এটা তার শোক সভায় ব্যবহৃত হবে। বেশ কিছু লোক ছবিটার দিকে তাকাবে। রজনীগন্ধার ডজন চারেক ডাঁটি টুলের পায়ের কাছে রাখা। ধূপ জ্বলছে। তারকের মনে হল

ঠাকুর ঘরের মত ভক্তিপূর্ণভাব সঞ্চারের উদ্দেশ্যই যদি হয় তাহলে পরিমলের হাতে সিগারেট রয়েছে এমন ছবি উদ্যোক্তাদের নির্বাচন করা উচিত হয়নি। পরিমলেরই দোষ। ওকি কখনো শোকসভায় রাখা মৃতের ছবি দেখেনি!

সামনের দিকে জনা সাত-আট স্ত্রীলোক বসে। তারক তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছে না, তবু মনে হল ওরা কুরূপা নয়। পরিমল তাহলে রবি ঠাকুরের মত কিছু লিখেছে কি? ওর একটা পদ্যও পড়িনি। পাবলিকের অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ লোকের মত আমিও পড়িনি পরিমলের পদ্য। তারক অতঃপর যথেষ্ট ভরসা পেয়ে ভাবল জন চল্লিশ লোক যখন হয়েছে, তাহলে খুব কিছু খ্যাতনামা পরিমল নয়। বছর বছর ওর জন্ম বা মৃত্যু দিন নিশ্চয় পালন করা হবে না। রবি ঠাকুরের হয়। গগন বসুমল্লিকের দোতলার হল-ঘরে হত।

গৌরী গান গাইত প্রতি বছর। প্রত্যেক বছরই শুরু করত 'হে নূতন দেখা দিক' গানটা দিয়ে। ওর বাবা বসতো সামনের চেয়ারে। সবাই যখন বলত, আর একটা আর একটা, গৌরী তাকাত বাবার দিকে। গগন বসুমল্লিক ঘাড় নাড়লে আবার গান ধরত। তারকের মনে পড়ল একবার সেও চেঁচিয়ে বলেছিল, আর এক খানা শুনতে চাই আর একখানা। গৌরী আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছিল। একটি ছোট ছেলে বক্তৃতা মঞ্চের কিনারে বসে। তারকের পিছনে একজন বলে উঠল, "বোধ হয় পরিমলের ছেলে।"

আর একজন বলল, "না। আমি দেখেছি একবার যাদবপুরে কবি সম্মেলনে, বাপের মতই রোগা।"

"তাহলে এ কে?"

তারক ছেলেটিকে লক্ষ্য করতে লাগল। মনে হয় ছেলেটির যাবতীয় কৌতূহল মিটে গেছে। এখন ঘাড় গুঁজে জুতোর ফিতে

টানাটানি ছাড়া আর কিছু করার নেই। মাঝে মাঝে যখন তাকাচ্ছে চোখ দেখে মনে হয় বিরক্ত। ঘরের এইকটা লোকের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে। একটা লোককে নিয়েই সবাই কথা বলছে, একই কথা কতক্ষণই বা শুনতে পারে! তারকের মনে হল ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া উচিত, বাইরে গোলদীঘিতে গিয়ে ও চোর-চোর খেলুক, নয়তো সাঁতার কাটা দেখুক। হয়তো ওর বাবা পরিমলের বন্ধু। ছেলেকে বেড়াতে আনা আর বন্ধুর শোক সভায় যোগ দেওয়া একই সঙ্গে সেরে নিচ্ছে।

এরপর তারক বক্তৃতা শোনার চেষ্টা করল। বক্তার চেহারাটা প্রায় দেবুর মত কিন্তু গলার স্বরে হুবহু হিরণ্ময়। মাইক্রোফোনটায় গোলমাল আছে তাই মাঝে মাঝে বঙ্কুবিহারীর মত হয়ে যাচ্ছে।

পরিমলের কবিতায় কি কি ব্যাপার আছে বক্তা তাই বোঝাচ্ছে।

তারক মনযোগে বক্তৃতা শুনল :

"সমাজ ও জীবনের অন্ধকার দিক অথবা প্রেম থেকে প্রেমহীনতার নিবিড় চেতনার ধ্যান-ধারণা, ভাবনা চিন্তা, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পরিমলের কাব্যে। কবি হৃদয়ের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ, বিক্ষোভ তাঁর কবিতায় সোচ্চার। মনীষার ব্যবহারে, ভাষার নিজস্ব শৈলীর সাহায্যে, বিচিত্র অপ্রচলিত বিষয়ে প্রচুর অধ্যয়নের উপকরণ ব্যবহার করে, প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে অব্যবস্থিত বিপরীতকে আবিষ্কার করার বিদ্রোহী কৌতুকের সাহায্যে পরিমল তাঁর কাব্যের পরিমণ্ডল রচনা করেছে—যে পরিমণ্ডলের স্বল্প আয়তনের মধ্যে ধরা পড়েছে ক্লান্তপ্রাণ নাগরিক হৃদয় থেকে ক্ষরিত বিবর্ণ শোনিতে আঁকা এক নিঃসঙ্গ পৃথিবীর ছবি।"

শুনতে শুনতে তারক যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হল। কোন লেখা থেকে না পড়ে, গড়গড়িয়ে এইসব কথা কি করে বলা সম্ভব! যা শুনল, সেগুলো মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে তারক বেকুব বনে

গেল। 'বিদ্রোহী কৌতুক' আর 'নিঃসঙ্গ পৃথিবীর ছবি' ছাড়া, একটি কথাও তার মনে নেই। এর মধ্যেই ভুলে গেছে। অথচ টানা পনের মিনিট ধরে লোকটা বলে গেল, একবার বগলও চুলকোল না! প্রত্যেকটা শব্দের উচ্চারণে মটর ভাজা চিবোনোর শব্দ। তারকের ধারণা জন্মাল, এই বক্তাটি খুবই পণ্ডিত এবং পরিমল হেঁজিপেজি কবি ছিল না।

তারক দেখতে পেল প্রণবকে। একটা খাতা নিয়ে প্রত্যেকের কাছে যাচ্ছে। খাতাটা এবং কলম বাড়িয়ে দিচ্ছে। লোকেরা ইতস্তত করে কি যেন লিখছে।

তারকের পিছনে তখন কথা হল দুজন লোকের মধ্যে :

"চল বাইরে যাই, অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি।"

"কেন, আর একটু পরে গেলেইতো হয় ?"

তারক দেখল খাতা নিয়ে প্রণব ক্রমশ তাদের দিকেই আসছে।

"আজ শেয়ালদায় নাকি ষ্টেট বাস পুড়িয়েছে।"

"তাই নাকি কখন ?"

"বিকেলের দিকে। ট্রাম-বাস এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেল কিনা কে জানে। তুই বস্, আমি বরং দেখে আসি।"

খাতাটা প্রণব এগিয়ে ধরল।

"কিসের !" তারক দ্বিধাগ্রস্ত হাতে খাতাটা নিল।

"বাঃ, শুনলি কি তাহলে ? পরিমলের প্রবন্ধ আর কবিতার একটা কালেকসান বার করা হবে, হাজার খানেক টাকার ব্যাপার।"

"গেছলি ডাক্তারের কাছে ?"

প্রণব এমন ভাবে তাকাল যেন বলতে চায়, এখন এই পরিবেশে ওই সব কথা, ছিঃ। তারক লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি খাতায় নিজের নামটা লিখে ফেলল। টাকার অঙ্ক বসাবার আগে অন্যরা কত দিয়েছে দেখল। পাঁচ টাকার কম কেউ নয়। এরকম দেওয়াটা

খুবই খারাপ দেখায়, কিন্তু পাঁচ টাকা এখন কোথায় পাব ? তাছাড়া আমার কি দায় পড়েছে পরিমলের বই বার করায় !

"তাড়াতাড়ি কর। টাকা পরে দিবি এখন অ্যামাউন্টটা লিখে দে।"

প্রণব বিরক্ত হয়ে বলল কেন ? ও বিরক্ত হয় এমন কাজ এখন কোনমতেই করা উচিত নয়। এই ভেবে তারক লিখে দিল পাঁচ টাকা। প্রণব চোখ বুলিয়ে পাশের লোককে খাতাটা এগিয়ে দিল হাসিহাসি মুখে।

তারক ভয়ে-ভয়ে ভাবল পাঁচ টাকা দেখে প্রণব খুশি হল কিনা কে জানে। হয়তো ডাক্তারের সংগে কথা হয়েছে কিংবা এখনো হয়তো যায়নি। পাঁচ টাকা দেখে ওর মনেই পড়বে না আমার কথা। সবাই যা দিচ্ছে তা না দিয়ে অদ্ভুত কিছু, পৌনে চার টাকা বা এগারো টাকা আট পয়সার মত কিছু লিখলে ওর মনে থাকত তারক সিংহ নামটা। তাহলে কালকেই যেত ডাক্তারের কাছে।

একবার তারকের ইচ্ছে করল খাতাটা চেয়ে নিয়ে, টাকার পরিমাণ শুধরে দেয়। তারপর ভাবল, এভাবে হয়তো, ওকে মনে পড়িয়ে দেওয়া যাবে না। যদি অনীতা থাকত আলাপ করিয়ে দিতুম। অনীতাকে দেখলে সহজে কেউ ভুলতে পারবেনা। ছেলেদের মত ওর শরীর। পাঁচটা টাকা ওর জন্যই গচ্চা গেল, গুহর উচিত এটা দিয়ে দেওয়া। তবে পরিমল পড়ত আমাদের সময়, আমার ছবি ছাপিয়েছিল, লিখে নাম করেছে, ওর শোকসভায় জনা চল্লিশ লোকও হয়েছে।

তারকের হঠাৎ গর্ব হল পরিমলের জন্য। আমার বন্ধু ষোল বছর আগের আলাপ, এখানে কজন আছে সে কথা বলতে পারে ? ঘাড় ফিরিয়ে তারক লোকেদের দিকে তাকাল। কারুর মুখ দেখেই তার মনে হল না, এরা পরিমলের বন্ধু। গুহকে পাঁচ

টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথাটা বললে নিশ্চয়ই দিতে চাইবে। বলবে, আমার কাজেই তো গিয়ে পাঁচ টাকা গচ্চা দিলেন। কিন্তু পরিমল আমার বন্ধু, একই ইয়ারে আমরা পড়েছি! গচ্চা শব্দটা এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না।

"কিরে ট্রাম-বাস চলছে দেখলি?"

"হ্যাঁ, লোকে যে কি প্যানিকি হয়েছে আজকাল। বাস-ট্রাম কিছু পোড়েনি। বাইরে গোলোকের সঙ্গে দেখা হল, বলল ছেলেটা পরিমলেরই।"

"যাঃ, আমি যে দেখলুম ওকে বাপের সঙ্গে, এইতো ছ-সাত মাস আগেই। সবে তখন ক্যানসারটা ধরা পড়েছে। ছেলেকে সব সময়ই কাছে কাছে রাখত।"

"গোলোকটা তো এতক্ষণ ধরে ক্যানসারেরই গল্প শোনাল। ওর বৌ নাকি কিছুতেই লুপ নেবেনা, নিলে নাকি ক্যানসার হবে। গোলক বলল, আরে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। ওসব ডাক্তারদের বাজে কথা, ছেলেপুলে হওয়া বন্ধ হলে ওদের আয় কমে যাবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। রোগের কারণটা জানলে তো তার ওষুধ বারকরা সোজা। ক্যানসারের ওষুধ বেরোলনা শুধু এই জন্যই। লুপ নেওয়ার কারণে ক্যানসার হয়, জানলেতো বিরাট আবিষ্কার হয়ে যেত।"

"গোলকের বৌ নিল?"

"নাঃ।"

বাচ্চা ছেলেটির হাতে রজনীগন্ধার একটি ডাঁটি। সেটা নাকের কাছে ধরে গন্ধ শুঁকছে। চোখ দেখে মনে হচ্ছে পুলকিত। এধার ওধার তাকিয়ে গুটিগুটি হাত বাড়াল আর একটি ডাঁটি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

তারকের বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল। মরবে জানার পর ছেলেকে পরিমল কাছে কাছে রাখত। ছ-সাত মাস মাত্র সময় পেয়েছিল। মা প্রায়ই বলত, তারু অত বাইরে-বাইরে থাকিস কেন? পরিমল কবিতা পড়তে গেলেও ছেলেকে নিয়ে যেত। নিশ্চয় ছেলেকে জানায়নি যে সে পিতৃহীন হতে চলেছে। লুকিয়ে পরিমল নিশ্চয় কাঁদত, আর কোনদিন ছেলেকে দেখতে পাবেনা ভেবে।

তারকের মনে পড়ল কাল ইঞ্জেকসান নেবার সময় তার ভয় করেছিল। তখন কি অমুর কথা ভেবেছিলুম? মনে করতে পারল না। হয়তো অমুকে ভালবাসিনা কিংবা মরার ভয়টা সত্যিকারের ছিলনা। তারক বক্তৃতামঞ্চের কিনারে বসা পরিমলের ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকল। এখন একটা কবিতা পড়া হচ্ছে, পরি-মলেরই লেখা। ছেলেটি কিছু শুনছে না। পিটপিট করে এধার ওধার তাকাচ্ছে আর হাতটা বাড়িয়ে রেখেছে ফুলের দিকে। তাল বুঝে একটা হাতিয়ে নেবার জন্য। ও জানে না, আজ কেউ ওকে বকবে না। সবাই আহা বলার জন্য তৈরী হয়েই এসেছে। বাবার মৃত্যুটা ও চোখে দেখেছে কিনা কে জানে। হয়তো ঘুমিয়েছিল পাশের ঘরে। পরিমল মরার সময় নিশ্চয় চেয়েছিল ওকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরতে। কাল মরে গেলে অমুর জন্য কিছু ভাববার সময়ই পেতুম না। কারুর জন্যই না। শীতের ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে মায়ের জন্য ডাক্তারের বাড়ি যেতে বলায় বাবার উপর ভীষণ বিরক্তি লেগেছিল। এই ছেলেটা তিরিশ বছর পর কতটুকু আর বাবাকে মনে করতে পারবে! তিন চার খানা বই আর ছবি ছাড়া পরিমলের আর কি থাকবে! অটোগ্রাফ ব্যাটটা আলমারির পিছনে রাখা আছে। ওটা দিয়েই শেষ সেঞ্চুরী করেছিলাম, মহমেডানের সঙ্গে লীগের খেলায়। অমু বড় হয়ে ছবিটা

ও দেখবে। ওর কি কখনো মনে পড়বে ডাক্তারখানায় কে একজন গাল টিপে বলেছিল—টেষ্ট খেলতে হবে, বুঝেছ?

এই মুহূর্তে অমুকে দেখার জন্য তারকের ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল। সিদ্ধান্ত নিল, কালকেই দক্ষিনেশ্বরে গিয়ে ওদের আনব। পরিমল ক্যানসারে মরেছে, কিন্তু আমাকে সেরে উঠতেই হবে। ঘড়ি দেখে চমকে উঠল তারক। ন'টা! প্রণবকে 'দেখতে পেল না। কিন্তু আর সে অপেক্ষা করলনা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল শোকসভা থেকে। ট্রামে কিম্বা বাসে পৌঁছতে কম করে পঁচিশ মিনিট লাগবে। ডাক্তারখানাটা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে ততক্ষণে।

বেরিয়ে এসে দেখল চারদিক থমথম করছে। রাস্তায় কাপড়ের দোকানগুলো বন্ধ, ফলে তাদের আলোগুলো না থাকায় রাস্তা অন্ধকার। গোলদিঘির ওপারে ইউনিভারসিটি বাড়ি, প্রেসিডেন্সি কলেজ অতিকায় জন্তুর পিঠের মত দেখাচ্ছে। ট্রাম-বাস বন্ধ। কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পুলিসের দুটো ভ্যান দাঁড়িয়ে। কিছু লোক, সন্তর্পনে দ্রুত চলাচল করছে। তারক একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, "আধঘণ্টা আগে শেয়ালদায় ফায়ারিং হয়েছে। সাতটা ট্রাম, দুটো স্টেট বাস পুড়েছে। বাড়ি চলে যান শিগ্‌গিরী।" হনহনিয়ে লোকটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

তারক ঘড়ি দেখল এবং উদভ্রান্তের মত রওনা হল। একটা খালি ট্যাক্সি দ্রুত যাচ্ছিল, হাত তুলতেই ড্রাইভার বলল, "শ্যামবাজার পর্যন্ত যাব।"

"তার বেশি আমিও যাবনা।" বলতে বলতে দরজা খুলে উঠে পড়ল তারক। এই সময় এমন এক সহৃদয় ট্যাক্সিওলা কলকাতায় অকল্পনীয়।

ডাক্তারখানায় পৌঁছে দেখল একটা পাল্লা বন্ধ, অন্যটা আধ-ভেজানো। তারক সন্তর্পণে ঠেলল।

"আজ এত দেরী করলেন। বন্ধ করে চলেই যাচ্ছিলুম।"

যুবকটি উঠে দাঁড়াল নিশ্চিন্ত মুখে। তারকও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ট্যাক্সি নিয়ে তাহলে ঠিকই করেছি। অবশ্য অত তাড়াহুড়ো না করলেও চলত। গালতোবড়ানো, চওড়াচোয়াল বুড়োটা দশটা পর্যন্ত থাকে। তাহলে একটা টাকা এ ছেলেটা পায়না। সেজন্য এক টাকা তিরিশ পয়সা খরচ করেও তারকের আফশোষ হচ্ছেনা।

"কিগো তারক চিনতে পাচ্ছনা?"

ঘরের কোণে বেঞ্চে যে একটা লোক বসে, তারক লক্ষ্যই করেনি। ভ্রূকুটি করে সে তাকাল। গেরুয়া পাঞ্জাবি থেকে স্যাণ্ডাল পর্যন্ত লোকটা এমন একটি রেখা যা অমু ছাড়া আর কারুর পক্ষে আঁকা সম্ভব নয়। দাঁত, ঠোঁঠ, নাক, থুতনি, কোমর, পিঠ কোনটাই সিধে নয়।

"আমাকে চিনলে না? আমি শম্ভু সরকার।"

"ওহ্ শম্ভুদা। আপনি এখানে যে?" তারক ওর পাশে বসল। "আপনার চেহারা একি হয়েছে!"

"আর চেহারা। মাঠে যাও?"

"না। সময় কোথায়?"

"মাঝে মাঝে আমি অবশ্য যাই। ওরা বলে ছেলেদের দেখিয়ে দেবার কেউ নেই, গিয়ে একটু দাঁড়াবেন, বলেটলে দেবেন। বলব আর কি! দুটো ড্রাইভ করেই ভাবে সি কে, ওয়াজির হয়ে গেছি। আজকাল তো ওদের হিরো হয়েছে সোবার্স। এখনকার ছেলেদের তো বোঝই, কেউ কথা শোনে? তোমরা ছিলে এক রকম। এখন কচ্ছ কি?"

"চাকরি করি। আপনি কি ডাক্তারের জন্য বসে?"

"না না, এটি হচ্ছে আমার ছেলে।"

পর্দা সরিয়ে যুবকটি তখন তারককে ডাকল। তারক ভিতরে উঠে গেল।

"টাকাটা এখনি দিন বরং তাহলে বাবাকে বিদেয় করে দি।" যুবকটি কাঁচুমাচু হয়ে বলল। তারক তক্ষুনি টাকা দিয়ে দিল।

দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকার সময় শম্ভু সরকার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল, "তাহলে চলি তারক।"

"অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হল।" তারক কাত হয়ে ঘাড় উঁচু করল, "আমি অনেকদিন খেলা ছেড়ে দিয়েছি শম্ভুদা।"

"ভালই করেছ। আমি ষোল বছর বয়সে প্রথম খেলি ক্যালকাটার সঙ্গে, এখন আটান্ন। কি লাভ হল! বয়স থাকতে থাকতে যদি সংসারে মন দিতুম, তাহলে কি আজ এই অবস্থা হয়? ঠিকই করেছ।"

কালকের মত আজ আর তারকের মরার ভয় হল না। শম্ভু সরকারকে প্রায় বারো বছর পর দেখে অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। লোকটা বহুবার তাকে অকথ্য গালাগালি করেছে। ক্লাবে নতুন ছেলে দেখলেই উপদেশ দিত। একটু ফুটফুটে হলেই বাড়িতে যেতে বলত। তাই নিয়ে হাসাহাসি হতো আড়ালে। তবে লোকটা চমৎকার আউট সুইং করাত ওই বয়সেও, খেলা বুঝতও ভাল। শম্ভুদাই প্রথম বলে দেয়, তোমার ভুল গ্রিপিং আর ব্যাকলিফটের জন্যই শ্লিপে অত ক্যাচ ওঠে, শুধরে নাও।

"আপনি কি ক্রিকেট খেলতেন?"

হাত থেকে ছুঁচটা টেনে বার করেই শম্ভু সরকারের ছেলে জানতে চাইল।

"আমরা দুজনেই অরুণাচল ক্লাবে খেলতাম। সে আজ ষোল সতেরো বছর আগের কথা। দেখছি শম্ভুদার শরীর খুবই ভেঙ্গে গেছে।"

"অত নেশা করলে শরীরের আর দোষ কি।"

যুবকটিকে খুবই বিরক্ত মনে হল তারকের। এটা তার ভালো লাগল না। গম্ভীর হয়ে সে বলল, "ওর হাত দিয়ে অনেক ক্রিকেটার বেরিয়েছে।"

"বেরুতে পারে।" যুবকটি তালা হাতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তারক ডাক্তারখানা থেকে বেরোবার সময় বলল, "আমি রঞ্জি ট্রফিও খেলেছি। ওর কাছে খেলা শিখেছিলুম বলেই তো।"

"আপনি বেঙ্গল প্লেয়ার!"

শম্ভু সরকারের ছেলে অবিশ্বাস ভরে তাকিয়ে আছে দেখে তারক অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। ও কেন, কেউই বিশ্বাস করবে না। চেহারা বা চলাফেরা অথবা বলার মধ্যে নিশ্চয় এমন একটা কিছু ফুটে ওঠে, যা দেখলে কারুর মনেই হয়না যে একদা সে হরিণের মত ছুটত বাউণ্ডারী লাইন ধরে, ক্যাচ ধরার জন্য ব্যাটসম্যানের পায়ের উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত সিলি মিড-অন থেকে। পপিং ক্রীজ থেকে দু গজ বেরিয়ে হাফ-ভলি করে নিত মিডিয়াম পেসের বল। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে তার ভিতরে, অসুখের মত, যা তাকে লক্ষ লক্ষ লোকের একজনে পরিণত করেছে। একটা কাঁকর, মনে হয় যেন সব সময় তার চেতনায় বিঁধে রয়েছে। সেটাকে খুঁটে ফেলে দিতে না পারলে দ্বাদশব্যক্তি হওয়া থেকে কোন দিনই রেহাই নেই। কিন্তু সেই কাঁকরটাকে খুঁজে বার করতে যাবে কি যাবেনা, এই দ্বিধা অবিরত তাকে দোলাচ্ছে। অথচ ঘটনা ছুটে আসছে এধার-ওধার থেকে। সে যেকোন সময় রান আউট হয়ে যেতে পারে।

"কতদিন আগে খেলেছেন, কার এগেন্স্টে?" যুবকটি উৎসুক চোখে তাকিয়ে। তারক তাইতে উত্তেজনা বোধ করল।

"বারো বছর আগে, এগেন্স্ট সার্ভিসেস।"

"বোলার না ব্যাটসম্যান ছিলেন?"

"অল-রাউণ্ডার। আট্‌টা উইকেট নিয়েছিলাম আর বিরাশি রানের মাথায় রান-আউট হয়ে গেলাম। কিন্তু জেতা ম্যাচটা আমরা হেরে গেলাম শুধু টুয়েলফথ্‌ম্যান্‌টার জন্য। হেমু অধিকারী তখন নাইনটির ঘরে, ওর একটা ড্রাইভ ধরতে গিয়ে আঙ্গুলে চোট খেয়ে মাঠ ছেড়ে এসেছি আর টুয়েলফথম্যান নামল। তিনটে বল পরেই অধিকারী হুক করতে গিয়ে ব্যাটের কানায় লাগিয়ে স্কোয়্যার লেগের মাথার উপর সোজা ইজি ক্যাচ তুলল। অ্যাণ্ড হি ওয়াজ ড্রপড বাই আওয়ার টুয়েলফ্‌থম্যান্‌। সেইখানেই ম্যাচ হাতের বাইরে চলে গেল।"

"কে ছিল টুয়েলফ্‌থম্যান্‌ ?"

তারকের ইচ্ছে হল অরুণাভ ভটচাযের নামটা বলতে। কিন্তু মনে হল, বললে অন্যায় করা হবে। অবশ্য অরুণাভ সেই বিরাশি রানের জোরেই আরো দুবছর খেলেছে, যতদিন অরুণ মিত্তিরের দাপট ছিল।

"মনে পড়ছে না নামটা তবে এই একবারই দেখেছি। যা গালাগাল খেল তার চোটেই খেলা ছেড়ে দেয়। ওহ্‌ এখনো সেই ব্যারাকিং কানে লেগে আছে।"

"আপনি কবে লাস্ট খেলেছেন ?"

তারক, সালটা মনে করার ভাণ করতে করতে দেখল দূরে নির্জন রাস্তায় একদল ছেলে রাস্তার বালব লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ছে। কর্কশ শব্দে ডাস্টবিন টেনে আনছে রাস্তার মাঝখানে। রিক্সা ওয়ালারা সিনেমার নাইট-শো-ভাঙ্গা সওয়ারি ধরার জন্য সার দিয়ে অপেক্ষা করছে, বিব্রত ভাবে।

"এখানেও শুরু হবে।" যুবকটি উৎসাহ ব্যঞ্জকস্বরে বলল।

তারক জবাব দেওয়া থেকে নিস্কৃতি পেয়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "কাল তাহলে ট্রাম বাস বন্ধ। কিকরে যে অফিসে যাব।"

"অফিস-টফিস আর হবে না। তবে দোকানদার ব্যবসায়ীদের লোকসান যাবে।" তারপর যুবকটি হেসে বলল, "কিন্তু ডাক্তারখানা খোলা থাকবে।"

"থাকলেই ভাল, কাল একটু তাড়াতাড়িই আসবখন। আজ চলি ভাই।"

বাড়ির দিকে যেতে যেতে তারকের মনে হল, এই ভাবে মিথ্যে কথাগুলো বলে কি লাভ হল। বলার সময় আত্মপ্রসাদ পাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু খানিকটা লজ্জা আর খানিকটা ভয় মিশিয়ে মনের মধ্যে চটচটে একটা কাদা যেন এখন লেপা হয়ে গেছে। ও জানতে পারবে না কে টুয়েলফথম্যান ছিল। ও না জানলেও, তারক ভাবল, আমি তো জানি। নিজেকে জেনে ফেলার মত ভয়ঙ্কর অবস্থা আর কিছুতেই হয় না।

তারকের এখন নিজেকে অক্ষম দুর্বল মনে হতে লাগল। এই ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য সে চাইল ঝাঁকুনি দেবার মত জোরালো একটা কিছু করতে যাতে সবাই চমকে তাকাবে। বেপরোয়ার মত একটা কিছু, তাকাতেই হবে এমন একটা কাজ। লাফিয়ে বেরিয়ে এসে ওয়েস হলকে সোজা সাইট স্ক্রীনের উপর দিয়ে ছয়! লর্ডসের মানকড়ের মত একটা ইনিংস!

॥ আট ॥

গলির মুখেই বঙ্কুবিহারী দাঁড়িয়ে। তারককে দেখে এগিয়ে এসে বলল, "সেই মেয়েটা এসে অনেকক্ষণ বসে আছে।"

শোনামাত্র তারক ভাবল পার্কে গিয়ে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আসি, কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবে। যা বলবে তাতো জানিই। কিন্তু গুহকে কিছুতেই বলতে পারব না, বিয়ে করো। বলাবলি করা আমার কাজ নয়। যা পারো নিজেরাই ঠিক করে নাও। আমাকে আর জড়িও না।

"গোলমাল হয়েছে নাকি শেয়ালদার দিকে?"

"কোথায়! ট্রাম-বাস তো চলছে।"

'আর দেরী করিসনি, ওকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বল, রাত হয়েছে। দেবুকেও তো শুতে হবে।"

তারক মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বাড়ি ঢুকল। বৈঠকখানার দরজা থেকেই সে দেখতে পেল টেবলে রাখা বাহুতে কপাল ঠেকিয়ে অনিতা কুঁজো হয়ে বসে। ওর পিছনে এসে তারক বলল, "কি ব্যাপার, এত রাতে আবার কি দরকার পড়ল?"

চমকে অনিতা উঠে দাঁড়াল। তারকের হাবভাবে অভ্যর্থনার লেশ না পেয়ে হাসবার চেষ্টা করল কোনক্রমে।

"দরকার একটু পড়েছে তারকদা। আমি ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেছি, কি করব ভেবে পাচ্ছি না।"

ওর গলার স্বরে তারকের অস্বস্তি হল। মুশকিলে যাতে না জড়াতে হয় সেজন্য সাবধান হবার চেষ্টায় কব্জীটা তুলে ঘড়িতে চোখ রেখে বলল, "বলে ফেল।"

"আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"কে?"

"বাবা মা, সবাই।"

তারক ক্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মাত্র। গুহ পরশু দিন ঠিক এই রকমই ধাক্কা দিয়েছিল উপরের ঘরে। ঠিক এইভাবেই তখন সে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"কেন?" কোনক্রমে তারক বলতে পারল।

"সলিল বিকেলে গেছল। আমাকে বলল বিয়ে হতে পারে না, তুমি বরং অন্য কাউকে বিয়ে কর!" দ্রুত উত্তেজিত কথাগুলো অনিতার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। "শুনে থ হয়ে গেলুম। ও যে মুখের ওপর স্পষ্ট একথা বলবে ভাবতে পারিনি। কারণ জানতে চাইলুম, বলল তোমার সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই, বিরক্ত বোধ করি, বিয়ে হলে কেউই সুখী হব না তাই দুজনের স্বার্থেই এ বিয়ে হওয়া উচিত নয়। শুনে আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল, বললুম তাহলে আমার এই অবস্থা করলে কেন? ও কি বলল জানেন?"

অনিতা এমন ভাবে তাকাল যেন, আশা করছে তারক বলে দেবে বা অন্তত ঘাড় নেড়েও জানাবে সলিল কি বলেছিল। কিন্তু তারক গোটা শরীরটাকে জিজ্ঞাসা করে দাঁড়িয়ে থাকল।

"এই অবস্থা যে আমিই করেছি তার প্রমাণ কি, অন্য কেউও তো করতে পারে। ঠিক এই কথাই ও বলল, ঠিক এই কথাগুলো।"

অনিতা হাঁপাচ্ছে। তারক ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গেছে ধাক্কা সামলাতে। বিমূঢ় না হয়ে বরং তার মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল সলিলের এই কথাটায়। রান নেবার জন্য ডাক দিয়ে তারপর রান আউট করে দেবার মত ব্যাপার।

"এমন নোংরা কথা ও বলবে আমি ভাবতেও পারিনি তারকদা। আজ চার বছর আমাদের পরিচয়। কত কথা, কত চিঠি। ওকে ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, পৃথিবীর আর কাউকে জানি না, সত্যি বলছি, অথচ এমন জঘন্য অপবাদ দিল! আমার কাছে ওর সব চিঠিই আছে এই দেখুন।"

চামড়ার থলিটা খুলছে দেখে :তারক নিষেধ করল, কিন্তু শুনল না। দোমড়ান একটা চিঠি বার করে অনিতা বলল, "আপনি পড়ে দেখুন কি লিখেছিল। মাত্র দেড় বছর আগের চিঠি—তোমায় বিয়ে করব, যত বাধাই আসুক না; আমরা ঘর বাঁধব আলাদা, দুটির বেশী ছেলেমেয়ে আমাদের হবে না, এমন কি তাদের নাম পর্যন্ত কি রাখা হবে তাও, তাও ওতে লেখা আছে।"

অনিতার চোখ দিয়ে টপটপ জল পড়ল। তারক সমবেদনায় ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে গর্ত খোঁড়া চলেছে। গাঢ় স্বরে বলল "একটা বদমাস।"

"বলেছিল আমায় না পেলে বাঁচবে না।"

চিঠি এগিয়ে ধরা অনিতার হাতটা তারককে বাধ্য করল স্পর্শ করতে। তার মনে হল ভারী কোমল এবং উষ্ণ এই হাত যার ছোঁয়ায় প্রথম যৌবন বিচ্ছুরিত হয়। দরজার বাইরে দিয়ে কে চলে গেল। অনিতার হাত ছেড়ে তারক বলল, "তাড়িয়ে দিয়েছে, কেন?"

"আমাদের কথা সবই আড়াল থেকে বড়দি শুনেছিল! ওর জন্য এক পাত্র পাওয়া গেছে, দোজবরে। বাবা অফিস থেকে ফিরতেই তাকে সব বলে দেয়?"

"কি বলে দেয়?"

"সলিল বলেছিল প্রুভ করতে পারবে না আমিই এর জন্য দায়ী। তাইতে বলি, অ্যাবোর্সন আমি করাব না, তোমাকে বিয়ে করতেই হবে। আমারও মাথার ঠিক ছিল না, আরও অনেক কিছু তখন

বলেছিলুম। ও চলে যাবার পরই বড়দি মেজদি আর মা আমাকে ঘিরে ধরে। শেষ পর্যন্ত সব কথা খুলে বলতেই হয়। বড়দি কাঁদতে শুরু করে, জানাজানি হলে তো ওর বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। বাবা অফিস থেকে ফিরে আমাকে—"

অনিতা মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। তারক ওর পিঠে হাতের বেড় দিয়ে কাছে টেনে বলল, "কেঁদো না।" আর কি বলবে সে ভেবে পাচ্ছে না। চুলের গন্ধ আসছে। মাথাটা বুকে ঠেকানো। নিঃশ্বাসের সঙ্গে দেহটাও কাঁদছে।

ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হতে শুরু করল তারক। ওর মনে হল অনিতা এইবার পড়ে যাবে অতএব ওর নিতম্বের পিছনে উরু দ্বারা একটা আগল তৈরী করা দরকার। এবং ওর শিরদাঁড়ার সেই ফুলে ওঠা গ্রন্থিটিকে পিটিয়ে গুঁড়ো করে ফেলতে হবে মিহি পাউডারের মত। একটা কাঁকরও যেন না থাকে!

"তারকদা, আমি—"

অনিতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তারকের মুখের দিকে। তারক হাতটা কোমর থেকে তুলে নিল।

"আমার সর্বাঙ্গে ব্যথা। দরজা বন্ধ করে মুখ বেঁধে বাবা মেরেছে। আমি শুধু আজ রাতটুকু থাকব। শুধু রাতের মত আশ্রয় চাই। কাল ভোরেই চলে যাব।"

"কোথায় যাবে?" তারকের কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় ঘড়ঘড় করছে।

"আমার সর্বাঙ্গে ব্যথা তারকদা, বাবা ভীষণ মেরেছে।" অনিতা কাতর স্বরে ভিক্ষা চাওয়ার মত ভঙ্গি করল দেহের। তারক চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, "ওপরে চলো।"

অনিতা একই ভাবে দাঁড়িয়ে। তারক বিরক্ত হয়ে বলল, "কি হল!"

"আমি সলিলকে এখনো ভালবাসি।"

"বেশ তো। কিন্তু তাই বলে সারারাত কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এ ঘরে দেবু ঘুমোয়। তোমার জন্য কি সে ঘুমোতে পারবে না?"

অনিতা আর কথা না বলে তারকের সঙ্গে উপরে এল। বারান্দায় বঙ্কুবিহারী দাঁড়িয়ে।

"কি ব্যাপার। ও বাড়ি গেলনা যে?" বঙ্কুবিহারী রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ করল অনিতাকে দেখিয়েই।

"বাবা আজ এ থাকবে।"

উত্তর না দিয়ে বঙ্কুবিহারী নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তারক অপ্রতিভ মুখে অনিতার দিকে তাকাতেই সে বলল, "আমি বরং যাই।"

"কেন?"

"বোধ হয় আপনার বাবা—"

"তাতে কি হয়েছে? তুমি আমার ঘরে এস।"

তারক হাত চেপে ধরল অনিতার। বোধহয় হাতে ব্যথা তাই অনিতা যন্ত্রণাসূচক কাতর ধ্বনি করল। তারক গ্রাহ্য না করে ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এল নিজের ঘরে। আলো জ্বালল।

"তুমি হঠাৎ ও কথাটা বললে কেন?" তারক ক্রোধে থরথর কেঁপে উঠল।

"কোন কথা!"

"সলিলকে ভালবাস, এটা বলার কি দরকার ছিল? তুমি আমাকে কি ভাব? দুশ্চরিত্র, পাজি, শয়তান? তোমার এই দুরবস্থার সুযোগ নিতে চাই? অ্যাঁ, জবাব দিচ্ছনা কেন? অ্যাঁ, সবাইকে কি সলিল ভাব নাকি?"

"তারকদা আপনি ভুল বুঝছেন, আপনি আমায়—"

"থাক্ থাক্ আর সাফাই গাইতে হবে না। কিন্তু এখন যদি

আমি তোমায় কিছু করি, পারবে তুমি আটকাতে আমায় ?”

“কি বলছেন আপনি! আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? আমি বরং চলেই যাই।” অনিতা গম্ভীর হয়ে দরজার দিকে এগোতেই তারক ওর সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াল।

“তুমি আমায় অপমান করেছ। তোমার মত একটা কুচ্ছিত থার্ডক্লাশ মেয়ে, ফাঁদ পেতে ছেলে ধরার চেষ্টা করে যে, সে করবে অপমান আর আমি সহ্য করব! কেন কেন বললে গায়ে ব্যথা? ভেবেছ আমি ন্যাকা, কিছু বুঝিনা!”

“পথ ছাড়ুন। নয়তো আমি চেঁচাব। আমি লোকজড়ো করবো।”

“করো তুমি। আমায় সলিল গুহ পাওনি।”

“আপনি সলিলের থেকেও জঘন্য। ভেবেছেন কিছু বুঝিনা? যে কোন মেয়েই মতলব বুঝতে পারে গায়ে হাত দেওয়ার ধরণ থেকে। আপনাকে দেখে বিশ্বাস হয়েছিল তাই ভরসা করে এসেছি। কিন্তু আপনি যে এমন লোক সেটা বুঝতে পারিনি। আপনার এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।”

অনিতা কথাশেষ করে তারকের পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবে, দুহাত ছড়িয়ে ওকে বুকের উপর তারক টেনে আনল। তারপর ওর হাল্কা দেহটি অবলীলায় তুলে এনে খাটের উপর নামিয়ে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল।

অনিতা স্থির চোখে তাকিয়ে রয়েছে। দেহ কঠিন এবং সঙ্কুচিত। তারক উত্তেজনা লুকোবার জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করেছিল এইবার ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে গিয়ে এমন অদ্ভুত একটা শব্দ করল নাক দিয়ে, অন্য কোন পরিস্থিতিতে যেটা হাসির কারণ হত অনিতার। কিন্তু এখন তার দুচোখে ভয় ফুটে উঠল। খাট থেকে হুমড়ি খেয়ে তারকের পায়ের উপর পড়ে বলল, “তারকদা আমি পারব না।

আমায় ছেড়ে দিন, আপনার পায়ে ধরছি, আমি আপনার ছোটবোন হই তারকদা।"

বিরক্তিতে সারা মুখ দুমড়ে তাবক বলল, "চুপ করো। যাত্রার হিরোইন সাজতে হবেনা আর।"

এইবলে সে মাথানিচু করে অনিতার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড সুখ অনুভব করল। এই মুহূর্তে আর লক্ষ লক্ষ লোকের একজন নই, এই বোধ তার মধ্যে সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। এই বোধকে দীর্ঘায়ত করতে হলে অনিতাকে এই ভঙ্গিতে রেখে দিতে হবে। ওকে দয়ার প্রত্যাশী করে রাখতে হবে এবং তা করতে হলে ওকে মুঠোর মধ্যে রাখতে হবে। সেজন্য ওর দুর্বলতম স্থানটিতে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হবে এবং সেটি হচ্ছে সলিলের জন্য ওর ভালবাসা। দ্রুত এই সব ভেবে নিয়ে তারক গম্ভীর স্বরে, অনেকটা অনুতপ্ত লাঞ্ছনাকারীর অনুকরণে বলল, "ওঠো এবার। কাল তোমায় সলিলের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওর মার সঙ্গে কথা বলব।"

অনিতা মুখ তুলে তাকাল। দুচোখের ভয় এখন বিস্ময়ের দিকে এগোচ্ছে। এই সময়ই পাশের ঘর থেকে বঙ্কুবিহারী চেঁচিয়ে তারককে ডাকল।

"ব্যাপার কি ?" তারক ঘরে ঢোকামাত্র বঙ্কুবিহারী মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্নটা করল।

তারক সাবধান হয়ে গেল মনে মনে। এই স্বর প্রচণ্ড রাগ চেপে রাখারই ছদ্মবেশ। নিরাসক্ত কণ্ঠে তারক বলল, "যা বিপদে পড়ে এসেছে, কি আর করা যায়, থাকুক আজ রাতটা। কাল সকালে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

"থাকবে মানে ?" বঙ্কুবিহারী খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। "বাড়িতে একটা মেয়েমানুষ নেই, আর সোমত্থ মেয়ে কিনা রাত

কাটাবে। বিদেয় কর্, এখুনি বিদেয় কর্। ট্রাম বাস এখনো হয়তো বন্ধ হয়নি।"

"আগে শোন ব্যাপারটা।" তারক রাগ চাপতে চাপতে ঠিক করল প্রথমেই বঙ্কুবিহারীর কণ্ঠস্বর নামিয়ে আনতে হবে। অনিতা নিশ্চয়ই পাশের ঘরে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে। গলা নামিয়ে তারক বলল, "মেয়েটি সত্যিই বিপদে পড়ে এসেছে। নয়তো এত রাতে কেউ এভাবে আসে, নাকি আমিই ওকে রাতে থাকতে বলি। ও আমার ঘরে শুক, আমি বৈঠকখানায় শুচ্ছি।"

"এ বাড়ি কার?" বঙ্কুবিহারী ঈষৎ কুঁজো হয়ে শিকার দেখা জন্তুর মত স্থির চোখে তাকিয়ে, দাঁত চেপে আবার বলল, "কে মালিক এ বাড়ির?"

"তুমি!"

"তাহলে আমি বলছি, ও মেয়েটির এবাড়িতে রাত কাটান চলবে না। এরপর কোন কথা আর শুনতে চাইনা।" বঙ্কুবিহারী হাত তুলে দরজা দেখিয়ে দিল।

"বাড়ি তোমার ঠিকই, কিন্তু আমি টাকা দিয়েই বাস করি। আমার রাইট আছে যাকে খুশি আনার।" তারক রাগে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

"রাইট! মাসে মাসে কটা টাকা দিলেই বুঝি রাইট জন্মায়? আমি যদি গলাধাক্কা দিয়ে বার করেদি, পারিস তুই আইনের সাহায্য নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকতে? পারবি তোর ওই কটা টাকা মাইনেয় ঘর ভাড়া করে বৌ-ছেলেদের নিয়ে থাকতে? দশদিনও তো কুলোবে না।"

"কে বলেছিল আমার বিয়ে দিতে?" তারক বুঝছে সে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। তাই প্রসঙ্গান্তরে যাবার সামান্য সুযোগ পেয়েই গলা চড়িয়ে নিজের উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরে টেনে নিয়ে

গিয়ে বলল, "কেন একটা আকাট নির্বোধের সঙ্গে বিয়ে দিলে? তুমি দায়ী, তুমিই বদমাইসি করে এই বিয়ে দিয়েছ।"

"ছেলেমেয়ে যুগ্যিমস্ত হলে বাবা-মা তাদের বিয়ে দেয়, এটাই নিয়ম, এরমধ্যে বদমাইসির কি আছে! তুই কি কচিখোকা ছিলি? বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তো বাবা হলি।"

তারক জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পেলনা বঙ্কুবিহারীর এই অকাট্য বিদ্রুপের। বিশৃঙ্খল আবেগ দপদপ করে উঠল তার মাথার মধ্যে। স্নায়ুগুলো পোড়া কাগজের মত গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। নিজেকে অবিলম্বে সে স্তূপীকৃত ভস্মরাশিতে পরিণত হতে দেখছে। হতাশ ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলল, "আমার কাছে ব্যাপারটা একদমই নতুন ছিল। বাবা, তুমি তো বিবাহিত, নিশ্চয় বুঝবে তখন কিরকম উত্তেজনা হয়। আমিতো একটা মানুষ, কত সামলাবো, কিভাবে সম্ভব?"

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ছুটে এল বঙ্কুবিহারী। তারকের মুখের কাছে মুখ এনে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "মানুষ! তুই একটা মানুষ! তিনমাস কাছে বৌ নেই আর অমনি একটা মেয়েকে এনে ঘরে তুলেছিস। মুরোদ যে কত জানা আছে। ছ্যাখ, আমাকে ছ্যাখ।" বঙ্কুবিহারী টানটান হয়ে চিতিয়ে দাঁড়াল। "তোর মা মরার পরথেকে বারো বছর একইভাবে কাটিয়ে দিলুম। অথচ আমিও একটা পুরুষ। পারি, বুঝলি, অনেক সইতে পারি। আর তুই?"

"আমি কি?"

উত্তর দেবার জন্য বঙ্কুবিহারী কয়েক মুহুর্ত সময় নিল। তারমধ্যেই তারকের ডান হাতটি ক্লান্ত ভঙ্গিতে উদ্যত হল এবং অশেষ শ্রম-সহকারে নামিয়ে এনে বঙ্কুবিহারীর মুখে জোরে আঘাত করল। তারপর মৃদু চাপাকণ্ঠে সে বলল, "আমি জানি, আমি কি।" একথা বলার পর তার মনে পড়ল, ঘুরে পড়ে যাবার সময় বঙ্কুবিহারীর মুখ চাপা হাসিতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তারক কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। তখন ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত অনুভব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তার মনে হতে লাগল, প্যাড পরে যেন সে অপেক্ষা করছে। যে কোন মুহুর্তে এবার তাকে মাঠে নামতে হবে। এখন সে এগারোজনের একজন। এখন সে স্টেডি ওয়ান ডাউন ব্যাটসম্যান টি সিন্‌হা।

তারক নিজের ঘরে ঢুকে দেখল খাটের বাজু ধরে অনিতা কাঠের মত দাঁড়িয়ে। গম্ভীর স্বরে তারক বলল, "তোমার তো এখনো কিছু খাওয়া হয়নি।"

"আমি চলে যাই বরং।" ফিসফিস করে অনিতা বলল।

"কেন ?"

"আমার এখানে আসা উচিত হয়নি। আমি জানতাম না যে—।"

"কি জানার আছে তোমার ?" তারক ধমকে উঠল। "যা বলছি তাই করো। দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ো। সকালে তোমায় সলিলের বাড়ি নিয়ে যাব। তারপর দেখা যাক কি হয়।"

ঘর থেকে বেরিয়ে তারক নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। নীচে নেমে এসে দেখল দেবাশিস ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিভিয়ে চেয়ারে বসে তারক ছোট টেবলটায় পা তুলে দিল। দরজাটা খোলা। নতুন রান্নাঘরের সভ্যকলি হওয়া দেয়ালটা অন্ধকারে ওর চোখের সামনে ফ্যাকাসে আস্তরণ ধরে রেখেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে সে ভাবল, এই হচ্ছে বঙ্কু সিঙ্গির মুরোদ। শুধু ফিল্ডিংই খেটে যাবে, আর গলাবাজি করবে —সইতে পারি, অনেক সইতে পারি। একটিও ক্যাচ না ফেলে, লোকের হাততালি কুড়িয়ে, শেষমেশ, দারুণ এক টুয়েলফথম্যান হিসেবে নাম কিনে একদিন লক্ষ লক্ষের ভীড়ে বঙ্কু সিঙ্গি মিলিয়ে যাবে।

ভোরে দেবাশিস যখন ঘুম ভাঙ্গাল তখনো তারকের ঠোঁঠে হাসিটা লেগেছিল। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারক লাফিয়ে উঠল। কাল থেকে জামাটা পর্যন্ত খোলা হয়নি। দেবাশিস খানিকটা ইতঃস্তত করে বলল, "বড়বাবু এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। বললেন, দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছি বৌদিকে আনতে। আর আপনার ঘরে তালা দিয়ে গেছেন।"

কথা না বলে তারক কলঘরে ঢুকল। এবং বেরিয়ে এসে ভাবল ইঞ্জেক্সানটা এক্ষুনি নিয়ে নিলে কেমন হয়! তারপরই মনে হল, আমার ঘরে তালা দিয়ে যাবে কেন? অনিতা এত সকালেই চলে গেল না জানিয়ে? কিন্তু সে রকম তো হবার কথা নয়। তা'হলে কি ওকে তালা দিয়ে আটকে রেখে গেছে!

ছুটে উপরে এল তারক। প্রায় আড়াই সের ওজনের একটা তালা বন্ধ দরজার কড়ায় লাগান। দরজাটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলতেই আঙ্গুল গলে যাওয়ার মত পাল্লা দুটি ফাঁক হল। চোখ রেখে তারক শুধু অন্ধকার দেখল। ঘরের সবকটা জানলা বন্ধ।

"অনিতা, অনিতা।" তারক চাপা গলায় ডাকল।

"কি হবে তারকদা?" ঘরের মধ্য থেকে অনিতার ভয়ার্ত স্বর শোনা গেল।

"জানলাগুলো খুলে দাও, কোন ভয় নেই। তালা এখুনি খুলে ফেলব। তোমায় চাবি দিচ্ছি আগে আলমারি খুলে টাকা বার করে দাও।"

ফাঁক দিয়ে চাবি গলিয়ে দিল তারক। রাস্তার দিকের একটা জানলা খুলে যেতেই অনিতাকে দেখতে পেল সে। ফ্যাল ফ্যাল করে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে। তারক অধৈর্য হয়ে বলল, "আগে টাকা বের করে দাও। খুললেই ড্রয়ার দেখবে। তার মধ্যে একটা সিগারেটের কৌটায় আছে। যা আছে সব আনো।"

অনিতা কথামত কাজ করল। নোটগুলো পকেটে ভরতে ভরতে তারক বলল, "আমি ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে আনছি। পাল্লা থেকে কড়া দুটো খুলে ফেললেই হবে। ভয়ের কিছু নেই। গায়ে এখনো ব্যথা আছে কি ?"

"তারকদা যেভাবে পারুন খুলে দিন। কি লজ্জা, কি লজ্জা, আমি গলায় দড়ি দেব। আপনার বৌকে আনতে গেছে আপনার বাবা। ওরা এসে পড়ার আগে যদি না আমায় বার করতে পারেন তাহলে ঠিক গলায় দড়ি দেব।" বলতে বলতে অনিতা উপুড় হয়ে ফোঁপাতে শুরু করল।

তারক প্রায় দশ সেকেণ্ড জমাট বেঁধে রইল। তারপর গায়ের সবটুকু জোর জড়ো করে তালাটা ধরে টানল। কপালে চিটচিটে ঘাম ফুটছে। তালাটায় বার কয়েক হ্যাঁচকা টান দিল। ছুটে এসে দরজার উপর আছড়ে পড়ার উদ্যোগ করছে, দেখল দেবাশিস নিচে থেকে বিস্মিত মুখ নিয়ে উঠে এসেছে, শব্দ শুনে। ওকে মজা দেবার চেষ্টা না করে তারক হুড়দাড়িয়ে নীচে নামল। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় শুনল দেবাশিস পিছন থেকে বলছে, "আজ অফিসে যাবেন তো ?"

বড় রাস্তার মোড়ে পৌঁছে সে চারধারে তাকাল। কাঁধের উপর মুখবাঁধা থলি থেকে করাতের ডগা বা তুরপুনের হাতল বেরিয়ে আছে এমন একটা লোক দেখা যায় কিনা খোঁজ করতে থাকল। জনাপাঁচ খাকি পুলিশ রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে। অন্য সময় তারক নিশ্চয় খোঁজ করত, কোথায় কিসের গোলমাল বেধেছে বা রায়ট শুরু হয়েছে কিনা। চায়ের দোকানে যথারীতি ভীড়, বগলে থলি চেপে লোকেরা বাজার যাচ্ছে, ট্রাম স্টপে দু-একজন, ফুটপাথে কাগজওলা, সেলুনে দাড়ি কামাচ্ছে দুটো লোক, রিক্সায়

বাসিচোখে একটি বেশ্যা, মনোহারী দোকানটা আধখোলা, কিন্তু ছুতোর দেখতে পেল না তারক।

"কাগজে লিখেছে, কাল শ্যামবাজারে ফায়ারিং হয়েছে।" পাড়ারই এক প্রবীণ বাজার সেরে হন হন করে যেতে যেতে তারককে দেখে, না থেমেই বলল এবং অপেক্ষা না করেই আবার বলল, "বাজারে একদম মাছ নেই।"

লোকটার পিছনের দিকে তাকিয়ে তারক অস্ফুটে বলল, "তাই নাকি!" এবং ভাবল তাহলে কি ছুতোর পাওয়া যাবে না? নাকি এত সকালে ওরা বেরোয় না। বরং কোন কাঠগোলায় খোঁজ নিলে হয়।

তারক এলাকার সমস্ত রাস্তা দিয়ে, মনে মনে, দ্রুত হাঁটতে শুরু করল দু ধারে তাকিয়ে। নেই, নেই, নেই। একটার পর একটা রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে, চোখে পড়ছে না। সে ক্রমশই দমে যেতে শুরু করল। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে সে কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার কিনারায় পৌঁছে ভাবল, এখন যদি পাই তা হ'লে ধরে আনতে আনতেই তো এক ঘণ্টা কেটে যাবে। ততক্ষণে রেণুকে নিয়ে বাবা পৌঁছে যেতে পারে যদি ট্যাক্সিতে আসে।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে তারক ফিরতে শুরু করল অন্য পথ দিয়ে। পাঁচটা পুলিশ রাইফেল দেয়ালে ঠেকা দিয়ে চা খাচ্ছে। সাদা পোশাকপরা অফিসারটি ফুটপাথে সম্ভবত চায়ের দোকানেরই চেয়ার পেতে বসে। তারক লক্ষ্য করল, লোকটা তাকে দেখছে। ভয় করল তার। গ্রেপ্তার করে যদি! মিছিলে স্লোগান দিয়ে হাঁটার খবর হয়তো জানে। পায়খানায় যেতে পারছে না বলে হয়তো তিরিক্ষে হয়ে রয়েছে। যদি ধরে নিয়ে যায়, তাহলে অনিতাকে আর রক্ষে করা যাবে না। রেণু ওকে শেষ করে দেবে। তারপরই মনে হল, ইঞ্জেক্‌সান নেওয়াই তো বন্ধ হয়ে যাবে

মনে পড়া মাত্র অজান্তেই চোখ চলে গেল রাস্তার অপর পারে অহীনের ওযুধের দোকানটার দিকে।

অহীন দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে এমন একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে, যার পায়ের কাছে একটি থলি এবং সেটির দড়িবাঁধা মুখের থেকে করাতের ডগা বেরিয়ে।

"একে কি তুই ডেকেছিস?" তারক ছুটে রাস্তা পার হয়ে এসে বলল। "আমার ভাই ভীষণ দরকার, আমি নিয়ে যাই, পাঁচ মিনিটের কাজ, একটা কড়া খুলে দেবে দরজা থেকে, নইলে খুব মুস্কিলে পড়ব।"

কাতর স্বরে তারক অনুনয় করল যথাসম্ভব এক নিশ্বাসে। অহীন আশ্চর্য হয়ে পড়ল বটে কিন্তু প্রভাবিত হয়েছে কিনা বোঝা গেল না। ঠাণ্ডা, শুকনো গলায় সে বলল, "আমারও খুব দরকার। আগে আমারটা হয়ে যাক, তারপর নিয়ে যেও।"

"বিশ্বাস কর্, আমার খুব বিপদ হবে যদি এক্ষুনি দরজা না খুলতে পারি। একটা মেয়ে আটকা পড়েছে ঘরে। পাঁচ মিনিট, মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য।"

অহীন ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, "কাল রাতে বই আর জুতোর তুটো দোকান লুঠ হয়েছে। আমার জানলার তুটো কব্জা একদম ভাঙ্গা।"

"লুঠ হলে দিনে তো আর হবে না। আমি তো বলছি পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। কিগো কতক্ষণ লাগবে একটা কড়া খুলতে?"

ছুতোর মিস্ত্রিটি একটি সামগ্রী হয়ে এতক্ষণ তুই খদ্দেরের কথা-কষি শুনছিল। নিজেকে জাহির করার সুযোগ পেয়ে ভারিক্কি চালে তুদিক বাঁচিয়ে বলল, "না দেখে কি করে বলি কতক্ষণ লাগবে। তবে এ বাবুর কাজ বেশিক্ষণ লাগবে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি কাজ শুরু কর তো।" একজন রোগী আসতেই অহীন ঝামেলাটা শেষ করে দিতে চাইল, "আমার কাজটা হয়ে গেলেই তুমি নিয়ে যেও।"

অহীন তুই ইলেকসানে দাঁড়া আমি তোর হয়ে দোরে দোরে গিয়ে ভোট চাইব, পোলিং এজেন্ট হব, পঁচাত্তরটা ফল্‌স। ভোট দোব। শুধ্ এই ছুতোরটাকে ছেড়েদে পাঁচ মিনিটের জন্য—এই বলে যদি ওর পায়ে আছড়ে পড়ি! তারক ভাবল, তাহলে কেমন হয়!

"আপনি একটু ঘুরে আস্থন বাবু ততক্ষণ।" তারকের অসহায় ভাব দেখে ছুতোর গাঢ়স্বরে বলল। "আমি আপনার জন্য থাকবখন।"

শুনে ভাল লাগল তারকের। লোকটা এখন তো আমার ভগবান, বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র ওই রাখে। এখন ওকে ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না বলেই তার মনে হল। কেউ এসে ধরে নিয়ে যায় যদি।

তারক ফুটপাথে পায়চারী শুরু করল। প্রতি পদক্ষেপে সে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। অহীন যদি ইলেকশনে দাঁড়ায়, তাহলে বিরোধীপক্ষকে প্রাণ দিয়ে সমর্থন করবার প্রতিজ্ঞা তখনই সে নিল। মাঝে মাঝে সে ছুতোরের কাছে এসে দাঁড়ায়, আবার অস্থির হয়ে দূরে সরে যায়। এই সময় রোগীটিকে বিদায় করে অহীন দরজায় এসে দাঁড়াতে, তারকের হঠাৎ মনে হল, ওর কোন বন্ধু নেই, ও তুই-তোকারি ভুলে গেছে।

"ঘরে আটকা পড়েছে বলছিলে যেন?"

অহীন অনাগ্রহ প্রকাশের চেষ্টায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ওপারের খাকি পুলিশদের উপর। প্যাণ্টের পকেটে দেশালাই খুঁজছে।

"আমার এক বান্ধবী। কাল রাতে এসে পড়ে হঠাৎ।"

"বান্ধবী !"

অহীন পকেট থেকে হাত বার করতে পারল না। বাল্য-কালের মত করে চোখ ছুটো সরিয়ে এনে তারকের উপর রাখল।

"রাতে ছিল ! বৌ কিছু বলল না ?"

"বৌ এখন বাপের বাড়ি।"

"তাই বল্।"

অহীনের চাপা হাসি শুরু হল। দেশলাইয়ে সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ যেন মনে পড়ল, সিগারেটটা এগিয়ে ধরল, "নে, তুই খা।"

তারকের সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে অহীন বলল, "রাস্তায় কতক্ষণ দাঁড়াবি ভেতরে এসে বোস।"

স্প্রিংয়ের দরজা দেওয়া খুপরির মধ্যে তারক ঢুকতেই, অহীন জিজ্ঞাসা করল, "পেলি কি করে ?"

তারক লক্ষ্য করল উত্তেজনা, অহীনের গালের থুতনীর এবং চোখের কোলের চর্বিগুলোকে নিয়ে চটকাতে শুরু করেছে ফলে চোখছুটো উপচে উপচে উঠছে। দেখে কষ্ট হল তারকের। তাড়াতাড়ি বলল, "আমাদের অফিসেরই এক কলীগের ফিঁয়াসি।"

বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে অহীন কথাগুলোর সঙ্গে ধাতস্থ হল। তারপরই আবার সারামুখে চর্বির ডলাই মলাই শুরু হল। "আর তুই তাল বুঝে অমনি ভাগিয়ে আনলি ! সাব্বাশ্ ! এ চিকি সিঙ্গ্ল রান চুরি। তোর পেটে পেটে য়্যাত্তো ! কাল কি তোদের প্রথম হল ? আরে শালা বল্না সব। দেখতে কেমন ? উক্ এলেম আছে বটে তোর।"

তারক দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে শুনে গেল। জবাব না দিয়ে অহীনের অধৈর্যতা চাগিয়ে তুলতে তুলতে ভাবল, শালা

ছুতোরটাকে ছাড়লি না কেন। পনের কুড়ি মিনিট তো মোটে লাগত, তাতে কি এমন তোর সর্বনাশটা হয়ে যেত ?

"কিরে চুপচাপ যে ? বল না ?"

"কি আর বলব। দেখতে অবশ্য তেমন ভাল নয়, তবে ফিগার খানা ভালই! থার্টিসিক্স, হ্যাঁ আমি শ্যিওর, থার্টিসিক্সের বেশী তো কম হবে না, টোয়েন্টিফোর অ্যাণ্ড—তা প্রায় থার্টিএইটইতো মনে হয়। ভীষণ হট্। একজনের সঙ্গে বেশীদিন থাকে না। বড়জোর ছ'মাস। আমার আগে আরো চারজনের সঙ্গে ওর—"

"বাঃ বাঃ দারুণ তো! এই রকমই ভালো। একজনের সঙ্গে কি বেশীদিন থাকা যায়, কেমন বাসি বাসি লাগে। তোর লাগে না ?"

"কাকে, বৌকে ?"

অহীন থতমত হয়েই সামলে ওঠার জন্য বখাটের মত হেসে চোখ মারল। "আমারও একজনের সঙ্গে একবার জমে গেছল।"

তারকের মনে হল অহীন এবার একটা মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলবে। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে পাল্লা দিতে চায়। সদ্য গোঁপ ওঠা ছেলেরা যেসব কথাবার্তা বলে সম্ভ্রম কাড়তে চায় বন্ধুমহলে, অহীন এখন তাই শুরু করবে। ঘড়ি দেখে তারক হাই তুলল। ডান পা-টা টেবিলের উপর তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। অহীন গ্রাহ্য করল না পা-টাকে। ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, "ম্যারেড। হাতে একজিমা হওয়ায় ট্রিটমেণ্ট করাতে এসেছিল। স্বামীটা ডিগডিগে ক্ষয়া রুগীর মত আর ওর স্বাস্থ্য, মাইরি কি বলব। দেখেই বুঝেছিলম এই স্বামীর পক্ষে ওকে স্যাটিস্‌ফাই করা অসম্ভব।"

"তুই কি করলি ?"

"আমি ?" অহীন কিছুক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "একদিন গাড়িতে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেছলুম। একটা চুমু খেয়েছিলুম মোটে। আর কিছু নয়।"

অহীনের স্বর বিষাদে মুহ্যমান হয়ে যাওয়ায় তারকের মনে হল বোধহয় ও সত্যিকথাই বলছে। সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বর কোমল করে সে বলল, "আমাকে বললি না কেন ব্যবস্থা করে দিতুম। আমাদের একতলার ঘরটাতো খালিই পড়ে আছে।"

অহীন কথা বলল না। তারক দেখল ওর কণ্ঠনালী পিপাসার্তের জল খাওয়ার মত ওঠানামা করল। মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে। নিশ্বাসের সঙ্গে দু-চারবার করাত টানার শব্দ হল। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে। পা নামিয়ে সিধে হয়ে বসে তারক দুম্ করে টেবলে ঘুঁষি মেরে চেঁচিয়ে উঠল, "ঠিক আছে, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

"আস্তে বল আস্তে, কম্পাউণ্ডার এসে গেছে। ও আবার বাড়িতেও যায় কিনা।" অহীন তটস্থ হয়ে সুইংডোরের তলা দিয়ে তাকাল। কয়েক জোড়া পা দেখা যাচ্ছে। রোগীদের বোধহয়।

"কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি, তোর সঙ্গে যার চলছে ?"

"হ্যাঁ।" তারক ঘড়ি দেখে ভাবল, শালা, কালও তো আমায় দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলি। ছুতোরটার কাজ কি এখনো শেষ হল না! ইঞ্জেকসান্‌টা এখনই তো নিয়ে নিতে পারি! ছুতোর নিয়ে গিয়ে কড়া খুলে অনিতাকে বার করে দিয়ে বঙ্কুবিহারী আর রেণুর জন্য তারপর অপেক্ষা করতে হবে।

"বয়স কত রে ?"

"পঁচিশ ছাব্বিশ।"

ওরা এলে ফয়শালা হবে। তারক অন্যমনস্ক হয়ে ভাবল, কিসের ফয়শালা হবে ? অনিতাকে অসদুদ্দেশ্যে বাড়িতে আনিনি। সলিলকে দিয়ে ভজিয়ে দিলেই চলবে। তা করা এমন কিছু শক্ত হবে না।

"খরচ-টরচ করতে হবে ?"

"না না, সে টাইপই নয়।"

এখন আমার হাতের মুঠোয় সলিল। ওর কীর্তির কথা ফাঁস হোক নিশ্চয় তা চাইবে না। কিন্তু বঙ্কুবিহারী এমন একটা পরিস্থিতি পাকিয়েছে, সেটা এখন কি করে ছাড়ান যায়? অনিতাকে হাতে নাতে ধরিয়ে দিলে কি করব? কি বলব রেণুকে তখন?

"হ্যাঁরে নামটা কি?"

"রেণু।"

"উঠছিস কেন, বোস্ না আর একটু। চা খাবি? শুধু রেণু না রেণুকা? একটু সেকেলে ধরণের যেন, তাই না?"

"আমায় একটা পেনিসিলিন নিতে হবে। বোস, চট করে তোর কম্পাউণ্ডারের কাছ থেকে আগে নিয়ে আসি, তারপর বলছি।"

অহীনকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তারক ছিটকে খুপরি থেকে বেরোল। কম্পাউণ্ডার তখন এক রোগীকে বলছিল—"চালের বদলে গুলি দিয়ে কি ক্ষুধার্ত মানুষকে ঠাণ্ডা করা যায়, বলুন?" তারককে কাছে আসতে দেখে সে থেমে গেল।

ইঞ্জেকসান নেবার সময় ঘড়ি দেখে তারক অধৈর্য হয়ে উঠল। ছুতোরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খুপরির মধ্যে আর না ঢুকে এখান থেকেই ছুতোরকে নিয়ে চলে যাবে স্থির করল। অহীন বেরিয়ে এল। জামার হাতা নামিয়ে তারক ওর কাছে এসে দাঁড়াতেই অহীন ফুটপাথের কিনারে টেনে নিয়ে বলল, "রোগটোগ থাকলে কিন্তু চলবে না।"

"কার?"

"যার কথা বললি।"

"কোথায় বললুম!"

নিজেকে ঝরঝরে তাজা লাগায় তারক বিরক্তি প্রকাশ করল নির্ভয়ে। তাইতে অহীন থতমত হল।

"বাঃ আলাপ করিয়ে দিবি বললি না?"

"আরে দূর, সে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। ভাল ফিগার থাকা চাই, হ্যাণ্ডসাম হওয়া চাই, কিছু একটা গুণও থাকা চাই, এ সব কি তোর আছে? রোগীর নাড়ি টেপা ছাড়া আর পারিস কি?"

ছুতোরের কাজ শেষ হয়ে গেছে দেখে তারক আবার বলল, "তোর দোকানে পেনিসিলিনের দাম পাঁচ পয়সা বেশি নিল। এইভাবে লোককে ঠকিয়েই তো গাড়ি করেছিস।"

অহীন কিছুক্ষণ ওর দিকে পাংশু হয়ে তাকিয়ে থেকে, তাড়া খাওয়ার মত অবস্থায় খুপরিতে ঢুকে গেল।

ছুতোরকে সঙ্গে নিয়ে তারক হনহনিয়ে বাড়ির দিকে চলল। কিছুক্ষণ অহীনের অদ্ভুত মুখটা চোখে ভেসেছিল, এখন অনিতা, রেণু, বঙ্কুবিহারীর মুখ। ঘড়ি দেখে হিসাব করল। বঙ্কুবিহারী পৌঁছনর কতক্ষণের মধ্যে রেণু রওনা হবে সেটা নির্ভর করছে কিভাবে বঙ্কুবিহারী খবরটা জানাবে। সেই অনুযায়ী সময় লাগবে ধাক্কা সামলে উঠে, গোছগাছ করে, দুই ছেলেকে নিয়ে রওনা হতে। তারকের মনে হল, এজন্য আধঘণ্টা সময় যেতে পারে। ট্যাক্সি পাওয়া, সেটা বরাত। দুই থেকে পঞ্চাশ মিনিট এজন্য বরাদ্দ করা যায়। হিসাবটা সামলাতে সামলাতে মোড় ঘুরে সামনে তাকিয়েই সে পাথর হয়ে গেল।

ট্যাক্সিটা সবে থেমেছে। আধময়লা খয়েরী শাড়ি-পরা রেণুই প্রথম নামল। কোন দিকে না তাকিয়ে হন্তদন্ত হয়ে সে চলল বাড়ির উদ্দেশ্যে। আর এক দরজা দিয়ে বঙ্কুবিহারী আর গেঞ্জিগায়ে লুঙ্গিপরা রেণুরদাদা নামল। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিল বঙ্কুবিহারী। এরাও ব্যস্ত হয়ে গলি দিয়ে এগোল। ছেলেরা বা তোরঙ্গ-সুটকেশ আনারও সময় দেয়নি।

এবার আমি কি করব?

তারক ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। বঙ্কুবিহারী কি বলে ওদের নিয়ে এসেছে তা অনুমান করে লাভ নেই। অনিতার ভাগ্যে কি আছে, তা ভেবেও লাভ নেই। তারক শুধু ভাবল, এখনো তিরিশ-চল্লিশ বছর হয়তো বাঁচব, কিন্তু কিভাবে?

"চলুন বাবু দাঁড়ালেন কেন!"

ছুতোর মিস্ত্রি কিছুটা অবাক হয়ে গেছে। ট্যাক্সিটা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। তাকিয়ে ঢোঁক গিলল তারক। স্কোরবোর্ডে শূন্য রানে নয় উইকেট। এখন তাকে ব্যাট করতে যেতে হবে। তল-পেটে গুড়গুড় করছে। হাঁটু দুটো অবশ লাগছে। সে এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মাঠের এগারজন তাকিয়ে রয়েছে একাদশ ব্যাটস-ম্যানের অপেক্ষায়। চতুর্দিকে গুঞ্জন—টি সিন্‌হা, টি সিন্‌হা, টি সিন্‌হা।

হঠাৎ ছুটতে শুরু করল তারক।

॥ নয় ॥

সলিল সদর দরজায় এসে দাঁড়াতেই তারক ওকে হাত ধরে রাস্তার দেয়ালের ধারে টেনে আনল।

"গুহ তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই। এক্ষুনি। খুব বিপদে পড়ে গেছি।"

"আপনি বাইরের ঘরে এসে বসুন, আজ অফিস যাবেন না ?"

"না না, আগে কথা দাও, করবে।"

"আগে শুনি তারপর তো বলব।"

"ওঃ তুমি দেখছি বদলে গেছ একদিনেই। আগে তো এমন ছিলে না, কি ব্যাপার আমার উপর রেগে আছ ?"

"রাগ করব কেন !"

"তাহলে কথা দিচ্ছ না কেন ? খুবই সামান্য ব্যাপার। তার বদলে তুমি যা করতে বলবে, করব। অনিতার ওই ব্যাপারটা যাতে হয়, কথা দিচ্ছি করিয়ে দেব। এবার বল কাজটা করবে ?"

সলিলের নিরাসক্ত ভাবটা এতক্ষণে বদলাতে দেখে তারকের আশা হল। ওপরের বারান্দায় একজন প্রৌঢ়া এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় ক্রিকেট খেলছে ছেলেরা। সলিল বার কয়েক উপরে তাকিয়ে বলল, "চলুন হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাবে।"

মিনিটখানেক পরই তারক শুরু করল।

"কাল রাতে অনিতা এসে হাজির। ওকে বাড়ি থেকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"সে কি !" সলিল চাপা গলায় বলল। হাঁটার বেগ কমে এল।

"তুমি কাল গেছলে ওদের বাড়ি। তোমাদের মধ্যে যা কথা

হয়েছে বাড়ির লোক জেনে গেছে। তারপরই এই ব্যাপার। রাত্রে আমাদের বাড়িতেই ছিল। বাবা আপত্তি করে, কেন না তোমার বৌদি নেই। সে ক্ষেত্রে একটি মেয়ে রাতে থাকবে, আপত্তি হওয়া স্বাভাবিকই। কিন্তু এই গোলমালের সময় অত রাতে ওকে চলে যেতে বলাটাও স্বাভাবিক হত না। তাই নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়। আজ ভোরে বাবা, যে ঘরে অনিতা রয়েছে সেই ঘরে তালা দিয়ে, তোমার বৌদিকে নিয়ে এসেছে। আমি এই পর্যন্তই জানি।"

"আসুন এই পার্কটায় বসি।"

সলিল এগিয়ে গেল। তারক ইতঃস্তত করে ভাবল, বসলেই দেরী হয়ে যাবে। ওদিকে কি ঘটছে কে জানে। ব্যস্ত হয়ে সে বলল, "বসার দরকার কি, কথা তো শেষ হয়ে এল। এখন তোমায় গিয়ে অনিতার কি হল দেখে আসতে হবে, আর—"

তারক থেমে গেল। সলিল পিছিয়ে গেছে। তারক চোখে চোখ রাখতে পারছে না। সলিলের চোখে ভয়, জিজ্ঞাসা, সন্দেহ।

"তুমি গিয়ে বলবে অনিতার সঙ্গে তোমার বিয়ের সব ঠিকঠাক।"

"না। কিছুতেই আমি বলতে পারব না।" হঠাৎ হিংস্র দেখাল সলিলকে। তারক সাবধান হয়ে গেল।

"কেন পারবে না, তুমি তো আর অনিতাকে বলছ না, বলবে আমার বৌকে আমার বাবাকে।"

"না, কাউকেই বলতে পারব না। অনিতা কাল শাসিয়েছে, বিয়ে না কি করতেই হবে, দরকার হলে কোর্টেও যাবে। আমি যদি নিজে মুখে স্বীকার করি তাহলে ওরাই তো কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দেবে।"

"দেবে না, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

"বেশ দিল না, তাতেই বা আপনার সুবিধে কি। মামলা হলেই ওরা জানবে আমি ধাপ্পা দিয়েছি আসলে অনিতার সঙ্গে

আমার কোন সম্পর্ক নেই। আজ বেঁচে গেলেন কিন্তু দুদিন পর ওরা তখন আপনাকেই সন্দেহ করবে।"

"আহা, তুমি ভুল করছ গুহ। মামলা করা অনিতার পক্ষে সম্ভব নয় সে জন্য টাকা পয়সা লাগে, ও পাবে কোথায়? আর অন্য যে ব্যাপারটা, সেটাও ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাব।"

"করাবেন যে তার গ্যারান্টি কি? আপনি নিজেকে বাঁচাবার জন্যই এই সব করবেন বলছেন, বেঁচে যাওয়ার পর যদি না করেন?"

"গুহ তুমি এমন কথা কি করে বলতে পারলে। তিনদিন আগেও আমি অনিতাকে চিনতাম না। তুমি আমার পায়ে পর্যন্ত ধরলে উদ্ধার করে দেবার জন্য। কি দরকার ছিল আমার ডাক্তারের ব্যবস্থা করার জন্য ছোটাছুটির, তোমার মুখ চেয়েই তো? বল, বল, তোমার জন্যই আজ আমার এই অবস্থা, তুমিই তো ওই অখাদ্য পেত্নীটাকে এনেছিলে। না আনলে এসব কথা তোমায় বলতে আসতুম না। আমার সর্বনাশ তো তুমিই করেছ।"

"আমি করেছি! বাজে কথা, আপনি প্রথম দিনই ওকে খেদিয়ে দিলেন না কেন? কেন আস্কারা দিলেন? রাতে ও কেন রইল? এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো?"

"তুমি বলতে চাও কি?"

"যা বলতে চাই ঠিকই বুঝেছেন।"

"তোমায় আমি মারব, প্রচণ্ড মারব।"

তারক এগিয়ে এল। মাথার মধ্যে ঝনঝনানি শুরু হয়ে গেছে। গুমোট হয়ে আসছে চারিদিক। তার মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস নেবার জন্য একটা ছেঁদাও শরীরে নেই। এবার সে মারা যাবে। এখন গুহ যদি আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে দেয়!

"আমি মামলা করাব অনিতাকে দিয়ে। তুমি ওকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলাৎকার করেছ। পাশবিক অত্যাচার

করেছ। আমি সাক্ষি দেব। ভেবেছ পালাবে? কোথায়, কোথায়? যেখানেই যাও পুলিশ তোমায় ধরে আনবেই।"

এমন সুযোগ আর পাবে না সলিল গুহ, তারকের চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, এইবার তুমি আমার ছেঁদাগুলো আঙুল ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে পরিষ্কার করে দাও।

'তারকদা করবেন না, এসব করবেন না।" বলতে বলতে সলিল পিছু হটে যাচ্ছে দেখে, খপ্ করে তারক ওর হাত ধরল।

"আমি এই পার্কে বসে রইলুম। তুমি এসে খবর দেবে কি ঘটেছে। অনিতাকে ওখান থেকে নিয়ে আসা চাই। নইলে—"

ঝট্কা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে সলিল ছুটে পালাচ্ছে। দেখতে দেখতে তারকের অবসাদ এল। ভারী লাগছে শরীর। ঢুলতে ঢুলতে পার্কের মধ্যে ঢুকে সে ঘাসে শুয়ে পড়ল।

তারক ঘুমিয়ে পড়েছিল। শিশুকণ্ঠের কাকলিতে জেগে উঠল। দুটি বাচ্চা ওকে ঘিরে ছোটাছুটি করছে। তারক উঠে বসায় ওদের অসুবিধা হল, ওরা ইলেকট্রিক থামটার দিকে চলে গেল। পার্কে লোক কখন এল? বিকেল পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি ভেবে, তারকের খানিকটা অবাক বোধ হল। তারপরই মনে পড়ল গুহর আসবার কথা।

দাঁড়িয়ে সে চারধারে তাকাল। কোথায় গুহ! রাস্তাটা ফাঁকা-ফাঁকা। লোকেরা দ্রুত চলাফেরা করছে। এই দুটি ছাড়া পার্কে আর কোন বাচ্চা নেই। লক্ষ্য করে বুঝল এরা ভিখারির ছেলে। এতক্ষণে একটিও বাস যেতে দেখেনি। মনোহারি দোকানটা বন্ধ। তার পাশের মিষ্টির দোকানের একটা পাল্লা খোলা, একজনের শুকনো মুখ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গুহ কই?

তারক পায়চারী করতে করতে রাস্তার দিকে নজর রাখল। তারপর একটা বেঞ্চে বসে রইল। ক্রমশ বিকেল পড়ে এল।

পার্কটা একই রকম ফাঁকা পড়ে আছে। রাস্তাটা এখন একদমই জনহীন। চারদিক থমথমে হয়ে উঠেছে। তারক দূরের একটা বাড়ির বারান্দায় 'একটি কিশোরীকে দেখতে পেল! ভিতর থেকে এক বৃদ্ধা এসে যেন বকুনি দিচ্ছে। গোঁয়ারের মত মাথা নেড়ে কিশোরীটি দাঁড়িয়েই থাকল। এত দূর থেকে তারকের ওকে গৌরীর মত মনে হল। তারপর দেখল সশস্ত্র পুলিশ বোঝাই একটা ট্রাক দাপিয়ে যাচ্ছে।

গুহ কি এসে ঘুরে গেছে! হয়তো বাইরে থেকে উঁকি দিয়েছে। শোয়া মানুষকে দেখতে পায়নি। তারক অনুমান করতে চেষ্টা করল। যদি না এসে থাকে তাহলে, কিছু একটা ঘটেছে। রেণুর দাদা অনিতাকে মারধোর করতে পারে কি? করার কোন যুক্তি নেই। অনিতা গলায় দড়ি দেবে বলেছিল, দিয়েছে কি? সময় লাগে দড়ির ব্যবস্থা করতে, তার আগেই রেণু এসে পড়েছে। তাহলে গুহ কি পালাল?

তারক স্থির করল এখন সলিলের বাড়িতে যাবে। সকালের ব্যাপারটা কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে জানতে হবে। তবে একটা সন্দেহ আছে, সলিল আদৌ গেছে কিনা! অত্যন্ত ভীতু, হয়তো গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে আছে। তাহলে গুহর বাড়ির কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই বোঝা যাবে পরিস্থিতিটা কি। গুহ যদি গিয়ে থাকে এবং বলে আসে অনিতার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে, তাহলে রেণুকে (ওকেই এখন ভয়) বোঝান যাবে. পুরোটাই বঙ্কুবিহারীর কারসাজি। যে মেয়ে একজনকে ভালবাসে, তার পক্ষে কি সম্ভব আর একজনের সঙ্গে খারাপ উদ্দেশ্যে রাত কাটানো? তুমি কি পারো? এইভাবে বলে রেণুকে ঘায়েল করতে হবে। কিন্তু সলিল যদি না গিয়ে থাকে?

পার্ক থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ান কিশোরীটির দিকে তারক

আবার তাকাল। রেলিংয়ে গাল রেখে একদৃষ্টে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে। চুলের গোছা ঝুলছে। ঠিক এই ভাবেই গৌরী কখনো কখনো দাঁড়িয়ে থাকত। ফুটপাথের ধারে উনুন ধরাচ্ছে এক বিহারী-বৌ। দূর থেকে মোটর ট্রাকের শব্দ আসতেই ভয়ে উঠে দাঁড়াল। সিগারেটের দোকানের পাল্লা ফাঁক করে বিক্রি চলেছে। ধূমপানের ইচ্ছা হল তারকের। দুটো সিগারেট কিনল। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করল, "আজ হয়েছে কিছু?"

"মিলিটারি নে মছে।"

"তাহলে বেশ ঘোরাল হয়েছে। চলবে কিছুদিন।"

"হ্যাঁ। শুধু এই সবই চলুক, আর দোকান বন্ধ রেখে ছেলে বৌ নিয়ে আমি কোমরে গামছা বাঁধি।"

দোকানীর বিরক্তি দেখে সান্ত্বনা দেবার জন্য তারক বলল, "নেশার জিনিস, লোকে ঠিকই কিনবে। যতই গুলিগোলা চলুক আর দাঙ্গা যুদ্ধ হোক না, আপনার কেনাবেচা বন্ধ হবে না।"

লোকটি হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল, "হরতালেও।"

তারকও হেসে বলল, "নেশা এমনই জিনিস।"

"আমি কিন্তু বিড়ি সিগারেট এমনকি চা পর্যন্ত ছুঁইনা। এসব খেলে ফুসফুসের রোগ হয়।" দোকানী হঠাৎ বিজ্ঞ এবং গম্ভীর হয়ে উঠল।

"তাহলে আপনি এসব খারাপ জিনিস বিক্রি করেন কেন!"

"কি করব, পেট চালাতে হবে তো।" হঠাৎ তিরিক্ষে হয়ে গেল লোকটা। তারক সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করল।

সলিলদের বাড়ি যাবার গলিতে বেশ ভীড়। কিছুলোক জটলা পাকিয়ে আজকের নানাবিধ ঘটনা সম্পর্কে কথা বলছে।

তারক দাঁড়িয়ে পড়ল। বছর কুড়ি বাইশের একটি ছেলে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। তাই থেকে তারক বুঝল, আজ সারা কলকাতা

বিপ্লবের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করেছে। পথে পথে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মোকাবিলা করতে ব্যারিকেড রচিত হয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠছে কলকাতার রাস্তা। এখন আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

তারক হঠাৎ দেখল নারান গলির মধ্য দিয়ে আসছে। সঙ্গে আর একজন। তখুনি উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করবে কিনা ভাবতে ভাবতে শুনতে পেল—"আরে তারকদা! কাল যে আপনার খোঁজে বাড়িতে গেছলাম।"

যাক্ আজতো যায়নি! তারক প্রাথমিক ভাবে স্বস্তি অনুভব করল এবং মুখখানি অমায়িক করে বলল, "তাই নাকি! যা ব্যাপার কালথেকে শুরু হয়েছে, কখন গেছলে?"

"সন্ধে নাগাদ। আপনার বাবা বল্লেন এখনো ফেরেনি।"

"হ্যাঁ, কাল একটা শোকসভায় যেতে হয়েছিল। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কলেজে একসঙ্গে একই ক্লাসে পড়েছি, নিশ্চয় নাম শুনেছ, পরিমল ভট্টাচার্য, কবি ছিল।"

"পরিমল! আপনার বন্ধু ছিলেন পরিমল ভট্টাচার্য?"

তারক দেখল নারানের চোখে শ্রদ্ধা বিস্ময় ইত্যাদি উথলে উঠেছে। সেটা পরিমল না তারকের উদ্দেশ্যে বুঝতে পারল না সে। তবে বুঝল, নারানের কাছে তার দাম বেড়ে গেল। এতদিনে পরিমল এই উপকারটুকু তার করল। আর একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করল, নারান প্রথমে শুধু পরিমল বলল। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলা হয়। যদি সে ব্র্যাডম্যান হত 'তাহলে নারান বলত—তারক!

তাহলে অত্যন্ত বিশ্রি শোনাবে। নিজের নামটা কোনদিনই তারক পছন্দ করেনি। কয়েক বছর আগে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলত টি, সিন্‌হা। 'টি'-কে চাপ দিয়ে আধসেকেণ্ড প্রায় ধরে রেখে 'সিন্‌হা'-টা ফলো-থ্রুর মত পিছনে টেনে আনত। কিন্তু এখন

দেখছে কেউই সিংহ বলেনা, বলে সিঙ্গি আর তারককে দুমড়ে মুচড়ে, তার্কা। কিন্তু ব্র্যাডম্যানের মত হলে? অন্তত পরিমলের মত হলেও—

"আমার খুব প্রিয় কবি ছিলেন। ওঁনার অটোগ্রাফ আমার কাছে আছে।" নারান হাতদুটো পিছনে রেখে পদস্থ অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে যেন কথা বলছে। এটা ভাল লাগলেও তারকের মনে হল পরিমলের জন্যই নারান এসব করছে।

"তুমি কি পদ্য লেখ নাকি?"

"এই সামান্য এক আধটা—"বলতে বলতে নারান লাজুক হয়ে গেল।

"তোমার ইংরিজী পেপারে ফেল হওয়ার ব্যাপারটা আবার ওরা তুলছে! বলছে এত কম নম্বর পেলে তাকে কি করে অন্যদের টপ্‌কে ইণ্টারভ্যিউয়ে ডাকা যায়।"

তারক যা চেয়েছিল তাই হল। নারানের চোখ এবং দেহভঙ্গি থেকে পরিমলের জন্য ভক্তি শ্রদ্ধা সমীহ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়ল। হাতদুটো পিছন থেকে সামনে এল। কচলাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মন্থর গতিতে তারক এগোল। নারান পিছু নিল।

"ওটা ম্যানেজ করা যায় না তারকদা?" নারান নিচুস্বরে বলল যাতে ওর সঙ্গী শুনতে না পায়।

তারক ভাবল, আগাগোড়াইতো মিথ্যের উপর দিয়ে চালাচ্ছি। মন্দ পাওনা হচ্ছেনা। কিন্তু এটাতো এখন আমার সমস্যা নয়। আমাকে এখন দেখতে হবে সলিল কি করল।

"সেই চেষ্টাই তো ক'দিন ধরে করছি। কাল ওই শোকসভায় না যেতে হলে, অনেকদূর এগোতে পারতুম। একজনকে ধরার চান্স কাল পেয়েছিলুম।" ঘাড় ফিরিয়ে তারক দেখল নারানের মুখের ভাব

কেমন হল। "তবে জান, পরিমলের মধ্যে বরাবরই দেখেছি এক ধরণের বিদ্রোহী কৌতুক ছিল, তাই না ? ওর পদ্যের মধ্য দিয়ে, নারান তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, একটা অদ্ভুত নিঃসঙ্গ পৃথিবীর ছবি ফুটে ওঠে।"

"আপনি কি আর একবার চেষ্টা করবেন তারকদা ?" নারান যেন প্রাণপণে বিরক্তি চেপে রেখে বলল। তারক ভাবল, আর ওকে নিয়ে খেলা করা ঠিক হবে না। তাহলে হয়তো বিদ্রোহী হয়ে পরিমলেরই আনুগত্য নিয়ে ফেলবে। সলিলের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে দেখে তারক দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আমি কালই আবার লোকটাকে ধরব। চেষ্টা আমি করে যাবই। আফটার অল আই অ্যাম এ ক্রিকেটার।" তারক ভরসা দিতে নারানের কাঁধে তুটো চাপড়ও মারল। নারান বোকার মত হাসল।

"এই বাড়িতে আমাদের অফিসের একটি ছেলে থাকে তার খোঁজেই এসেছি।" তারক কণ্ঠস্বরের দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করল এইবার আমাকে রেহাই দাও। যে কাজে তুমি যাচ্ছিলে, যাও।

"কি নাম বলুন তো ?" নারানের সঙ্গী এতক্ষণে মুখ খুলল।

"সলিল গুহ।"

"আরে! সলিলদাকেতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আফিম খেয়েছেন তুপুরে।"

তারক কিছুক্ষণের জন্য ঝাপসা দেখল মুখটা। কিছুক্ষণ নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ ছাড়া আর কিছু তার কানে ঢুকল না। কিছুক্ষণ ধরে তার মনে হল, মাথা নিচু করে তাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। অবশেষে এই রকম অবস্থা থেকে সামলে উঠে কোন ক্রমে তারক বলল, "কেন ?"

"তা ঠিক বলতে পারব না। আমি ওদের পিছনের বাড়িতেই

থাকি।" নারানের সঙ্গী ও সলিলের প্রতিবেশী ভারিক্কি চালে বলল। "আজ সকালে ওদের বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছিল খুব।"

ওকে থামিয়ে তারক বলে উঠল, "কটার সময় ?"

"দশটা-সাড়ে দশটা হবে। একজন বুড়ো মতন লোক সঙ্গে একজন মেয়েছেলেকে এনে ঝগড়া করছিল।"

তারক আবার থামাল, "মেয়েছেলেটা বিবাহিতা না অবিবাহিতা ?"

"সেটা লক্ষ্য করিনি। তবে বোধহয় ঘোমটা ছিল।"

"কি রঙের শাড়ি পরেছিল ?"

"বোধহয় খয়েরি।"

"কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল ?"

"ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে আমাদের ঝি বলছিল, ওদের বাড়িতে অনিতা নামে একটা মেয়ে আসত, তাকে নিয়েই নাকি গণ্ডগোল। বুড়ো লোকটা জানতে চাইছিল, সলিলদার সঙ্গে অনিতার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে কিনা। সলিলদা নাকি বলে, ওসব বাজে কথা। তখন বুড়োটা বলে, বাজে কথাই যদি হয় তাহলে মেয়েটা বলছে কেন ওর পেটে বাচ্চা রয়েছে তোমার ? সলিল দা বলে, মিথ্যে কথা। বাচ্চা থাকতে পারে কিন্তু আমার নয়, অন্য কোন লোকের। অনিতা নাকি আরো অনেক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত। ওদের অফিসেরই একজন, কি একটা নাম বলল যেন সলিলদা, তরুণ না তারা, তার সঙ্গেও নাকি অনিতার ব্যাপার স্যাপার আছে।"

"তারপর ?"

"তারপর সলিলদার বাবা-মা ওদের বার করে দেয় বাড়ি থেকে। বুড়োটা যাবার সময় নাকি শাসিয়েছে অনিতাকে নিয়ে এসে পাড়ায় সকলের সামনে ওর মুখ দিয়ে বলাবে ওই বাচ্চা কার।"

"অনিতাকে নিয়ে এসেছিল কী তারপর ?"

নারানের সঙ্গী উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। সলিলদের বাড়ি থেকে এক প্রৌঢ় বেরোচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে নারানের সঙ্গী বলল, "জ্যাঠামশাই সলিলদার খবর পেলেন ?"

"পটল এইমাত্র হাসপাতাল থেকে ফোন করে বলল, ডেঞ্জার পার হয়ে গেছে আর ভয়ের কিছু নেই। আধঘণ্টা দেরী করে হাসপাতালে আনলে নাকি কোন আশা থাকত না।"

"সলিলদার খোঁজ নিতে এই ভদ্রলোক এসেছেন।"

তারকের দিকে হাত তুলে দেখাল নারানের সঙ্গী। এই সময় বড় রাস্তার দিকে চাঞ্চল্য দেখা দিল। গলির মুখ থেকে কিছু লোক ত্রস্তে ভিতরে ঢুকে আসছে। পর পর সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হচ্ছে। চীৎকার করে বারান্দা থেকে ছেলেকে ডাকাডাকি করছে এক স্ত্রীলোক। কোন এক বাড়ির ছাদ থেকে কেউ গম্ভীর গলায় কার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'বোধহয় মাণিকতলার দিকে আগুন দিয়েছে।'

"আমি আর সলিল একই অফিসে কাজ করি। আজ অফিস যায়নি, তাই ভাবলুম ফেরার পথে একবার খোঁজ নিই।" তারক এগিয়ে এসে বলল। প্রৌঢ়কে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছে। ইনিই যে সলিলের বাবা সেটা বুঝতে তারককে মাথা ঘামাতে হল না।

"দেখুন তো সলিলকে বিপদে ফেলার জন্য কি জঘন্য চক্রান্ত শুরু হয়েছে। আচ্ছা আপনাদের অফিসে তারক বলে কেউ আছে কি ?"

তারক সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে গেল গলা পর্যন্ত। শুধু আড়-চোখে দেখল নারানের চোখে বিস্ময় ও কৌতূহল। আপনা থেকেই ওর মুখ দিয়ে বেরোল, "কেন বলুন তো ?"

"সেই লোকটাই এর মূলে। আপনি চেনেন কি এই তারক সিংহকে ?"

"নাঃ। বোধহয় অ্যাকাউণ্টস কি ব্রাঞ্চ সেকশানে কাজ করে। তিন-চারশো লোকের অফিস তো।" তারক অবিচলিত স্বরে বলল এবং লক্ষ্য করল নারানের চোখ বিস্ফারিত হয়েছে।

"আপনার নাম?"

"হিরণ্ময়," এক মুহূর্ত থমকে তারক যোগ করল, "মান্না।" বলেই সে ঘুরে দাঁড়াল। হুড়দাড় করে লোকেরা ছুটে আসছে গলির মধ্যে। ট্রাকের এঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বেশ দূরে দুটো মাঝারি ধরণের পটকা ফাটার শব্দ হল।

"জানেন হিরণ্ময় বাবু, ওই তারক সিংহের জন্য আজ আমার ছেলে মরতে বসেছে। জানেন, এই লোকটা একটা আইবুড়ো মেয়েকে ফাঁসিয়ে আমার ছেলের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। তার বাবা-বৌ আজ এসে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছে। আর খোকা লজ্জায় অপমানে—"ফুঁপিয়ে উঠল প্রৌঢ়।

'পালান, পালান, পুলিশ ঢুকছে। হাতে রাইফেল।" বলতে বলতে কয়েকটি যুবক ছুটে আসছে।

ভীত স্বরে নারান বলল, "তারকদা আর দাঁড়াবেন না।"

"জানলেন হিরণ্ময় বাবু—"

"তারকদা বিপদ হবে, এবার পালান।"

"ওই তারক সিংহকে আমি দেখে নেব। আপনাদের অফিসে কালই যাব। সবাইকে খুলে বলব। আর—"

তখন ছুটতে শুরু করেছে তারক। গলির ভিতরের দিকে নয় বড় রাস্তার দিকে। রাস্তার আলো নেভান। মোড়ে পৌঁছে দেখল অন্ধকার খাঁ খাঁ করছে। এবার কি করব? তারক অসহায়ের মত সামনে পিছনে তাকাল এবং এবার ইঞ্জেক্সান নিতে হবে, মনে পড়ে যাওয়ায় তখনি আশ্বস্ত হল। একটা উদ্দেশ্য আপাতত পেয়ে মন দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে সে হাঁটতে শুরু করল।

॥ দশ ॥

রাস্তার আলোগুলো দূরে দূরে। দুধারের বাড়িগুলোয় কোন প্রকার ব্যস্ততা নেই। রাস্তাটা হাত পঁচিশেক চওড়া। তার দুপাশে ঘাসের পাড়। তারক দাঁড়িয়ে থেকে একবার দূরের ব্রিজটা দেখে কাছের টালা ট্যাঙ্কের দিকে চোখ তুলল। ব্রিজটা অন্ধকার। রেল ইয়ার্ডের ওধারের বাড়িগুলোর আলো দেখা যাচ্ছে। ইয়ার্ডের দেয়ালে ঘুঁটে দেওয়া। শুকনো গোবরের গন্ধ ছাড়া আর কিছু নাকে লাগছে না। রাতের এই সময় রোজই এই রকম নির্জন থাকে রাস্তাটা। মাঝে মধ্যে প্রাইভেট মোটর যায়। ছোটবেলায় টালাপার্কে ক্রিকেট খেলতে আসার জন্য এই রাস্তাটা তারক ব্যবহার করত। এখানে তখন ছিল মিলিটারীদের আস্তানা। পরে হয় আর্মড পুলিশদের। তখন টালা ব্রিজে ফুটপাথ ছিল দেড় হাত।

তারক পায়চারির ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল। এইভাবে এখন কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ নয়। ঘড়িতে দেখল আটটা বেজে দশ। বহুদূরে শব্দ হচ্ছে। কোন্‌টা রাইফেলের কোন্‌টা বোমার, তারক পার্থক্য করতে পারল না। বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। কে যেন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। গৌরী কী? ইঞ্জেকসান নেওয়া হয়নি এখনো তার। একটাও ডাক্তারখানা খোলা পায়নি। স্ত্রীলোকটি বারান্দা থেকে ঝুঁকে দেখছে রাস্তাটা। তারকের মনে হল বোধ হয় গৌরী নয়। যদিও বেশ কয়েক বছর সে গৌরীকে দেখেনি, তাহলেও এরমধ্যে নিশ্চয় এত মোটা হয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু ডাক্তারখানা খুঁজতে খুঁজতে গৌরীর বাড়ির সামনে এসে পায়চারি করছি কেন? সমস্যাতো ইঞ্জেকসান নেওয়ার!

গৌরী মোটা হয়েছে কি হয়নি, সেটা জানার জন্যই প্রাণ হাতে করে কি এখানে এসেছি? তারক এইসব চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়ে নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল। এবং প্রাণপণে সিদ্ধান্ত নিল! গৌরী নয়, ইঞ্জেকসান নেওয়াটাই জরুরী। কিন্তু পরিস্থিতি বাদ সেধেছে। এইসব ঝামেলা ঠিক এই দিনেই বাধাবার কি দরকার ছিল? তারক নিজেকে ছেড়ে তার চোখের সামনে যা কিছু পড়ছে, সেগুলির উপরই বিরক্ত হতে শুরু করল। তার মনে হল, লক্ষ লক্ষের সমস্যার যোগফল এই হাঙ্গামা এর মধ্যে আমার কোনই অবদান নেই বা এইসব বোমা গুলি আগুন টিয়ারগ্যাস দিয়ে আমার সমস্যার সমাধান হবে না। সুতরাং আমি যখন লক্ষ লক্ষের সমস্যার সঙ্গে জড়িত নই বা জড়াবার প্রয়োজন হচ্ছে না, তখন আমায় রেহাই দেওয়া হোক। এখন আমার দরকার পাঁচলক্ষের একটা পেনিসিলিন ইঞ্জেকসান। না হলে কোর্সের মধ্যে ছেদ পড়বে। তাহলেই কেঁচে গণ্ডুষ।

কিন্তু কাকে বলব আমায় রেহাই দেওয়ার জন্য? তারক ঘুঁটে লাগান দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, লক্ষ লক্ষের জীবন যাপনের সঙ্গে জড়িত এই বিপ্লবের এবং রক্তপাতের বিরুদ্ধে আমার একার সমস্যাটাকে কোনমতেই দাঁড় করান যায় না। ভাবতেই কেমন হাসি পাচ্ছ। যদি পালাবার কোন উপায় বার করা যায়! হিরণ্ময়, বঙ্কুবিহারী, প্রণব রেণু, নারান, সলিল প্রভৃতি এদের সবাইয়ের কাছে যদি যথাযথ থাকতে পারি! ওরা যেভাবে আমায় দেখতে চায়, সেইভাবে যদি দ্বাদশব্যক্তি হয়ে আজীবন ফিল্ডিং খেটে যাই তাহলে আমার, শুধুই আমার, বলতে কোন সমস্যাই আর থাকবে না। তাহলে হয়তো মুক্তি পাব। তখন নিশ্চয় বলতে পারব—সইতে পারি, সব সইতে পারি। কিন্তু আমার দ্বারা চমৎকার একটা দ্বাদশব্যক্তি হওয়াও বোধহয় সম্ভব

হবে না। ঠিকই ক্যাচ ফেলব, ত্নপায়ের মধ্য দিয়ে ঠিকই বল গলে যাবে। জেতা ম্যাচ হারব আমারই জন্য। আর গ্যালারিতে বসা লোকেরা গালাগাল দেবে—বেরিয়ে যা ব্যাটা, বেরিয়ে যা। উত্তেজিত মুখগুলোয়, স্লোগান দিতে থাকা বিমল মান্নার মত গ্যাঁজলা উঠবে। ক্রুদ্ধ হাতগুলো, প্যাভেলিয়ানের দরজা দেখাবে বঙ্কুবিহারীর মত। আর আমি তখন ভাবব, বোলারকে থামিয়ে কেন দেখে নিলাম না পীচের উপর কোন কাঁকর রয়েছে কিনা।

থমকে দাঁড়াল তারক। তিন গজ দূরেই, সদর দরজার লাগোয়া দেয়ালে ওই কাঠের তক্তায় কি লেখা? নামের পরে, ডি-ফিল, এল এল বি, না এম বি বি এস? তারক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ত্নপা এগোলেই শাদা অক্ষরগুলো দৃষ্টির সীমানায় এসে যাবে কিন্তু তারক এগোতে পারছে না। পা ত্নটো জমিতে সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথা মনে হচ্ছে তার। ছমছম করছে বুক। যদি ডাক্তারের নামই লেখা হয়! ওদের কাছে কি পেনিসিলিন থাকে? স্যাম্পল্ দেয় না কি পেনিসিলিন কোম্পানীরা?

"কে? কাকে চাই?"

তারক চমকে উপরে তাকাল। বারান্দা থেকে একটা ভারী জবরদস্ত মুখ ঝুঁকে দেখছে। তারকের স্বরনালী থেকে আলতো হয়ে বেরিয়ে এল, 'ডাক্তারবাবু আছেন?"

"কি দরকার? এখন কোথাও যেতে টেতে পারব না।"

"আজ্ঞে, কোথাও নিয়ে যাবার জন্য আসিনি।" তারক মুখ তুলে গলা চড়িয়ে বিনীত কণ্ঠে বলল, "একবার নীচে আসবেন?"

"কেন?"

"একটা ইঞ্জেকসান নেব। পেনিসিলিন।"

"সঙ্গে এনেছেন?"

"না।"

"তবে ?"

"আপনার কাছে পাওয়া যাবে না ?"

"না।"

তারক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। উপর থেকে ফেলে দেওয়া স্বরধারা হুবহু গগন বসুমল্লিকের মত। শোনামাত্রই তারকের ভিতরটা কাঁচুমাচু হয়ে গেছে। একবার গোপালকে ডাকতে গিয়ে এইরকম ভাবে তাকে কথা বলতে হয়েছিল। দোতলা থেকে গগন বসুমল্লিক বলেছিল, "কি দরকার এখন ?" তারপর, "এখন ওর পড়ার সময়। এখন খেলতে যাবে না।" তখন তিনতলার ছাদের পাঁচিলের কিনার থেকে গৌরী হাত নেড়ে একটা চিঠি দেখাচ্ছিল দেবার জন্য। কিন্তু তারক তখন লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। গৌরীর চিঠিতো সে নিলই না, নিজের লেখা চিঠিটাও পকেটে নিয়ে ফিরে আসে। তারপর দিন চার পাঁচ ওমুখো আর হয়নি।

দূর থেকে মোটর হেডলাইটের আলো আসছে। তারকের মনে হল, এভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটা উচিত। যদিও এখানে হাঙ্গামা হচ্ছে না এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার মত জনতাও ত্রিসীমানায় নেই। তবু এই নির্জনতা, ছিনতাইকারীর এবং উত্তেজিত প্রেমিক যুগলের অনুকূল চতুষ্পার্শ্বের অন্ধকার, একক লোকের পক্ষে নিরাপদ বোধ হচ্ছে না। তারক হাঁটতে শুরু করল এবং একটি মোটর পিছন থেকে তাকে অতিক্রম করে ধীরে চলে গেল। তখন সে একপলক তাকিয়ে দেখতে পায়, ড্রাইভার আসনে বসা পুরুষ-টির কাঁধে মাথা রেখে একটি স্ত্রীলোক। এতে সে অন্যদিনের মত আমোদ পেল না, বরং একটু অবাক হল। এমন সময়েও এরা বেরিয়েছে! নিশ্চয় অহীনের মত কোন উল্লুক। এরপর তার মনে হল, এবার আমি কি বাড়ি ফিরব ?

গৌরীদের দোতালার বারান্দায় আবার এসে দাঁড়িয়েছে। তারক মন্থর হতে হতে বারান্দার তলায়ই দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে ঝুঁকে দেখছে।. তারক মুখ তুলে তাকাল এবং অবিলম্বেই জেনে গেল গৌরীই। তারক পরিচিতের ভঙ্গিতে হাসল। হাত তুলে তাকে অপেক্ষা করতে বলে গৌরী বারান্দা থেকে সরে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সদর দরজা খুলে গৌরী বলল, "একটু আগে দেখলাম তুমি পায়চারি করছিলে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না তুমিই না অন্য কেউ।"

"এদিকেই এসেছিলাম ডাক্তারের কাছে। বাড়ি নেই. তাই ভাবলাম ঘরে বসে কেন আর অপেক্ষা করি। তোমরা এখানেই থাক সেটা নারানের কাছে শুনেছিলাম। ও প্রায়ই আমার কাছে আসে চাকরির জন্য।"

"ভেতরে এসে বসো। উনি সেই সকালে বেরিয়েছেন। চারদিকে যা শুরু হয়েছে, ভেবে মরছি বিকেল থেকে।"

গৌরীর সঙ্গে বৈঠকখানায় এল তারক। ছিপছিপে গৌরী স্থূল শ্লথ হয়েছে। কণ্ঠস্বর চালে ভারিক্কি। গায়ের রঙ্ একটু ফ্যাকাসে পরণে গৃহিণী সুলভ তাঁতের শাদা সাড়ি। হাতে কানে নাকে গলায় কিছু সোনার গহনা। অবয়বে অলস স্বচ্ছলতা। তারক কিঞ্চিৎ দমে গেল।

"অনেকদিন পর দেখা হল। বাড়ির সবাই কেমন, কটি ছেলে পুলে?" গৌরী একটি সোফায় তারকের মুখোমুখি বসে বলল।

"ভালই আছে। ছেলে এখন দুটি। তোমার কটি?"

"তিনটি। দুই ছেলে এক মেয়ে। কালকেই ওরা পিসীর বাড়ি বেড়াতে গেছে। কথা ছিল উনি আজকে ওদের নিয়ে আসবেন। কিন্তু ওরা এখনো যে কেন আসছে না। ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেছি।"

"পিসীর বাড়িতে ফোন করে দেখনা, ফোন নেই তোমাদের ?"

"আমার আছে কিন্তু ননদের নেই। ওরা বাড়ি করে এই সেদিন যাদবপুরে উঠে গেছে, এখনো ফোন পায়নি।"

তারকের মনে হল, কথা বলতে বলতে গৌরী তাকে যেন খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করছে। তারক আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে ভাবল, কি দেখছে ? আকৃতি, পোষাক না মানসিকতা ? চেহারা, যতদূর মনে হয়, এই বয়সে যেমন হওয়া উচিত—পাতলা চুল, কোমরে ও তল পেটে চর্বি, দাঁতে পানের ছোপ, গলায় ও ঘাড়ে চর্বির দাগ, প্রভৃতি দ্বারা বয়সোচিত। তবে দুদিন দাড়ি কামান হয়নি। মনে হওয়া মাত্র তারক তালু দিয়ে গাল ঘষল এবং ভাবল, তবে শার্ট এবং প্যাণ্ট যথেষ্ট ময়লাই। ঘরের এইসব আসবাব অর্থাৎ সোফা, দেয়ালে টাঙ্গান কয়েকটি নিসর্গ চিত্র, দুটি আলমারিতে কিছু মাটির ও পিতলের পুতুল এবং ঝকঝকে বই, উজ্জ্বল শাদা দেয়াল, বিচিত্র নক্সার পর্দা ও কার্পেট এবং এসবের সঙ্গে মানানসই একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবস্থান তার পক্ষে এখন কিছুটা অপ্রতিভকর মনে হচ্ছে।

"আজকাল নতুন টেলিফোন পাওয়া খুব শক্ত। আমি চার বছর আগে অ্যাপ্লাই করেছি, এখনো পাইনি।" বলেই তারকের মনে হল, এইসব বলার জন্যই কি এতদিন পরে আমি এখানে এসেছি !

"তুমি কিন্তু একই রকম রয়েছ অথচ আমি কত মোটা হয়ে গেছি।"

"কই !" তারক অবাক হবার চেষ্টা করে বলল, "একই রকম তো রয়েছ, বরং আমিই তো মোটা হয়েছি।" বলার পর স্পষ্টই বুঝল, গৌরী বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ওর মুখের উপর আরামের আস্তরণ পড়ল। তবে কি এই দেখার জন্যই এতদিন পরে এলাম !

"ডাক্তারের কাছে এসেছিলে বললে, কি হয়েছে ?"

"অসুখ।" বলেই কথা ঘুরিয়ে তারক জিজ্ঞাসা করল, "তুমি বোধ হয় অনেকদিন বাপের বাড়ি যাওনি।"

"যাই, বিজয়ায় মাকে প্রণাম করতে। তাছাড়া আর সময় কোথায়? তোমার বৌ বছরে কবার বাপের বাড়ি যায় বলতো? তাওতো আমার পাঁচ বছর পর তোমার বিয়ে হয়েছে। তোমার ছেলেরাও নিশ্চয় স্কুলে যায় না।"

"এইবার ভর্তি করাব। আমাদের ওদিকে একটা ভাল স্কুলও নেই। যে দুএকটা আছে, তাতে এমন ভীড়, চেনাশোনা না থাকলে ভর্তি করানই যায় না। তোমার জানাশোনা কেউ আছে?"

"ওনার থাকতে পারে। কিন্তু দেখতো, আমি এখন কি করি! ছেলেমেয়েদের নিয়ে কখন যে আসার কথা, কটা বাজল?"

হাত ঘড়ি দেখে পনেরো মিনিট কমিয়ে তারক সময় বলল।

"এখন ওদের শুয়ে পড়ার সময়। আচ্ছা, খুব হাঙ্গামা হচ্ছে কী? চাকরটা বলল, শ্যামবাজারের দিকে নাকি খুব গুলি চলেছে। ওইখান দিয়েই তো ওদের আসতে হবে। কি যে করব এখন ভেবে পাচ্ছি না। ওরা তো গাড়িটাড়ি পুড়িয়ে দেয়?"

"লাল ক্রশ চিহ্ন থাকলে ছেড়ে দেয়। ডাক্তারদের কিছু বলেনা।"

"উনিতো ডাক্তার নন্, তাছাড়া মুখে যদি গন্ধটন্ধ পায় তাহলেতো মারধোরও করতে পারে। কতবার বারণ করেছি তবু একদিনও কথা শোনেনা।" অধৈর্য হয়ে গৌরী উঠে দাঁড়াল। রাস্তার জানলার পর্দা তুলে এধার ওধার তাকিয়ে ফিরে এসে আর সোফায় বসল না। "চা খাবে, কিংবা কফি?"

"নাহ্। সকাল থেকে অনেক খেয়েছি।"

হঠাৎ ঘর থেকে গৌরী বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা না ফেরায় উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত। অথচ আমি! তারক ভাবল, বাবা-বৌয়ের সামনে

আজীবন আমাকে দাঁড়াতে হবে। সলিল গুহের বাবা অফিসে গিয়ে যে সব কথা ব'লে আসবে, তার সামনে আরো কুড়ি বছর বসতে হবে। রোগ সারাতে ইঞ্জেকসান নিতে হবে। অথচ আমি এইসব ভাবনা মাথায় নিয়ে, এখানে বসে গৌরীর সঙ্গে সদ্য পরিচিত প্রতিবেশীর মত আলাপ করছি। এখন বোধহয় আমরা অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করতে পারি—আজ কি রান্না হল? বা তোমরা কি এবার বড়ি দিয়েছ? অথচ বছর বারো আগে একেই আমি ভীষণ ভালবাসতাম!

অথচ, তারক সোফায় হেলান দিয়ে দেয়ালে ঝোলা একটি বাগানের নিসর্গ চিত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবল, গৌরী আমার সঙ্গে পালাতে রাজি ছিল। যদি সেদিন পালাতাম দুজনে! এতবছর পর তাহলে এই ঢঙেই আমাদের কথাবার্তা হত কী? প্রেম তো ওই ছবিটার ফুল গাছগুলোর মত, প্রেমিক-প্রেমিকা দুজন শুধুই মালী। তাদের কাজতো গাছকে জীইয়ে রাখা। যত ভাল সার জল রোদ হাওয়া দিয়ে পরিচর্যা হবে তত ভাল ফুল ফুটবে। সেজন্যই কি প্রেমের কাণ্ড-কারখানায় ফুল দেখান হয়, পাশে রাখা হয়, বিনিময় করে হুঁশ করিয়ে দেওয়া হয়? কিন্তু কী সার, কী জল দিতে হবে রেণু তা জানেনা। আমার মানসিকতা অনুযায়ী রেণু রোদ হাওয়া খেলাতে পারেনা। কিন্তু গৌরীই কি পারত? শুধুই আবেগ আর শরীর আর রূপ দিয়ে কি প্রেম টিঁকে থাকতে পারে?

গৌরী অবসন্নের মত ঘরে ঢুকল। মুখে উদ্বেগ। সোফায় বসে হতাশ স্বরে বলল, "মিস্টার ভাদুড়িকে ফোন করলাম। উনি প্রায়ই ছুটির পর তাস টাশ খেলতে ওর বাড়িতে যান, আজ যাননি। আশ্চর্য তাহলে কোথায় গিয়ে কি যে কচ্ছেন।"

"কে মিস্টার ভাদুড়ি?" তারক প্রশ্নটি করে, তিন সেকেণ্ড থেমে একই স্বরে, হেলান দেওয়া অবস্থাতেই বলল, "আমাদের আগের কথা মনে পড়ে গৌরী?"

ধাক্কা সামলে ওঠার পরই, গৌরীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অস্ফুটে বলল, 'মনে পড়ার মত কোন কথা আছে নাকি!"

তা অবশ্য নেই, তবু মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ে। হয়তো আর বছর দশেক পর একদমই মনে পড়বে না। সংসার, অফিস, অসুখবিসুখ নিয়েই ব্যস্ত থাকব। একটা বয়স পর্যন্তই এসব মনে থাকে। কিন্তু তোমার মনে আছে কিনা এটা জানতে ভীষণ কৌতূহল হয়।"

"কেন মনে থাকবে না। তবে এখন তুমি ওগুলো নিয়ে নতুন করে নিশ্চয় সম্পর্ক ঝালাতে চাইবে না!" গৌরীকে আবার উদ্বিগ্ন দেখাল।

তারক মাথা নাড়ল। "তার কোন উপায়ই আর নেই। কিন্তু মুশকিল কি জান, একটা কাঁকর আমার মাথার মধ্যে ঢুকে রয়েছে। সেটা অনবরত খচ্‌খচ্‌ করে।"

"কি করে ঢুকল? অ্যাকসিডেণ্টে?" গৌরী উদ্বিগ্ন স্বরে বলল।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে পিছনে মাথা হেলিয়ে তারক বলল, "আমি জানিনা কি করে ঢুকল। জেনে এখন কোন লাভও নেই।"

"কিন্তু একটা কাঁকর মাথায় নিয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে? তুমি অপারেশান করাও।"

"কত লোকই তো এভাবে বেঁচে রয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোক!"

"বাজে কথা রাখো। কাঁকর লক্ষ লক্ষ লোকের মাথায় ঢোকে না। এগুলো অদ্ভুত ঘটনা, দু'একটাই ঘটে।"

"তোমার মাথাতেও আছে, গৌরী, কিন্তু তুমি তা জান না।"

"তাহলে ঠাট্টা হচ্ছিল এতক্ষণ! ব্যাপার কি, ডাক্তারের কাছে এসেছিলে বললে না?"

তারক জবাব দিতে যাচ্ছিল, একটি আধবুড়ো লোককে ঘরে

ঢুকতে দেখে থেমে গেল। লোকটি গৌরীকে বলল, "বাবু ফোনে আপনাকে ডাকছেন।"

শোনামাত্র হাঁসফাঁস করে উঠে প্রায় ছুটে গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারক ভাবল, আমি কি সৌভাগ্যবান, এই মেয়ে-মানুষটিকে বিয়ে করতে হয়নি! এবার আমি চলে যেতে পারি এখান থেকে। গৌরী এখন চমৎকার ফিল্ডিং দিচ্ছে। হাততালি পাবার জন্য ও উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমারও উদ্বিগ্ন হবার মত অনেক ব্যাপার রয়েছে অথচ বহুক্ষণ ধরেই তানিয়ে মাথা ঘামাইনি। আশ্চর্য!

গৌরী ফিরে এল মুখে হাসি নিয়ে। "ছেলেমেয়েদের আজ আর আনছে না। কলকাতা জুড়ে দারুণ গোলমাল চলছে। বাব্বাঃ, যা চিন্তায় পড়েছিলাম।"

"তোমার স্বামী আজ ফিরবেন তো?"

"না। এই হাঙ্গামার মধ্যে গাড়ি নিয়ে কেউ আসতে পারে নাকি? কোথাও রয়ে যাবে। রাত কাটাবার অনেক জায়গাই ওর আছে।"

গৌরীর মুচকি হাসিটা তারক লক্ষ্য করল। তার মনে হল যেন সামান্য অভাববোধ গৌরীর মধ্যে রয়েছে, যেজন্য ও নিশ্চিন্তে ফিল্ডিং দিতে পারেনা। অবশ্য এক সময় আর বুঝতেই পারবে না যে ওর কিছু নিজস্ব চাহিদা আছে। তখন ষোলআনা সুখী বোধ করতে ওর বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হবে না।

"এই গোলমালের মধ্যে তুমি বাড়ি যাবে কি করে?" গৌরী আবার উদ্বিগ্ন হল।

"ভাবছি তোমার এখানেই থেকে যাব।" হালকা চালে হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে তারক বোঝাতে চাইল এটা মজা করার জন্যই বলা।

"কিন্তু চাকরটা রয়েছে যে?" সামনে ঝুঁকে চাপাস্বরে গৌরী বলল। "উনি কাল বাড়ি ফিরলে হয়তো কথাপ্রসঙ্গে ওকে বলে দিতে পারে।"

"কি বলবে!"

"তুমি এখানে রাতে ছিলে।"

"কিন্তু এরকম হাঙ্গামার মধ্যে কোন লোক এসে পড়লে, রাতে তার থেকে যাওয়াটাইতো স্বাভাবিক। তাছাড়া, তোমার স্বামীতো জানেই না আমি কে! তাহলে অত ঘাবড়াবার কি আছে?"

"কিন্তু তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, বলব কি?"

তারক দেখল গৌরী আবার উদ্বিগ্ন হয়েছে। এবার সে আর মজা বোধ করল না। গম্ভীর হয়ে বলল, "এক সময় আমার প্রেমিক ছিল, একথা নিশ্চয় বলতে পারবেনা বা দাদার বন্ধু বললেও অনেক রকম সন্দেহ করতে পারে। তার থেকে বরং তুমিই বলো, আমাকে দেখে কী মনে হয় অর্থাৎ যা বললে তোমার চাকর পর্যন্ত অবিশ্বাস করবে না?"

"কিন্তু তুমি কি সত্যিই রাতে থাকবে!" গৌরী বিব্রত চোখ মুখ নিয়ে বলল এবং দ্রুত প্রশ্ন করল, "কেন?"

"আচ্ছা আমাকে প্রাইভেট টিউটর কিংবা বাজার সরকার বলে চালান যায় কী?"

"কিন্তু তুমি এতদিন পরে, এই রকম একটা সময়ে হঠাৎ এলে কেন, মতলবটা কী?"

তারক এইবার গৌরীর চোখে সত্যিকারের ভয় দেখল। কাল ঠিক এই সময়ই অনিতার চোখেও সে এই রকম চাহনি দেখেছিল। তারকের মাথাটা মুহূর্তে গরম হয়ে উঠল। কঠিন এবং তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, "আমি এখনি একটা পাঁচলাখের পেনিসিলিন চাই। আমার অসুখ হয়েছে।"

"কী চাই ?"

গৌরী হতভম্ব হওয়ায় তারক আবার বলল, "পাঁচলাখের একটা পেনিসিলিন পেলে আমি এখানে রাতে থাকব না।"

"কোথায় পাব আমি ? কোন সুস্থ লোকের কাছে কি শুধু শুধু পেনিসিলিন থাকে! সত্যিই তোমার মাথার মধ্যে কাঁকর ঢুকেছে।" আশ্বস্ত হয়ে গৌরী এবার হাসল। ওর মুখ থেকে উৎকণ্ঠার দাগগুলো মুছে গেছে। অল্প আমোদ ঝকমক করে উঠল চোখে। এমনকি প্রগাঢ় স্বরে সে বলেও ফেলল, "এখানেই আজ খেয়ে যাও বরং। মুরগী কিনেছিলাম সকালে।"

এইবলে গৌরী দরজার দিকে এগোতেই তারকও উঠে দাঁড়াল। তাইতে গৌরী ফিরে তাকাল এবং একপা একপা করে পিছু হটে দরজার ওধারে পৌঁছে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"মুরগী নয়, পেনিসিলিন চাই। নয়তো তোমার মাথাতেও কাঁকর ঢুকিয়ে দেব।" তারক শাসানি দেবার যাবতীয় চেষ্টা স্বর-নালি এবং মুখভঙ্গিতে প্রয়োগ করল। গৌরী পিছনে তাকিয়ে খুঁজল চাকরটি কোথায়। দোতালায় ওঠার সিঁড়ির ধারে বড় ছেলের ক্রিকেট ব্যাটটি দেখতে পেয়েই ছুটে গিয়ে সেটা হাতে নিল।

তারক ঘর থেকেই দেখল স্কোয়্যার-কাট করার ভঙ্গিতে গৌরী ব্যাটটা তুলে অপেক্ষা করছে। শ্রান্ত পদক্ষেপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গৌরী উঁচু করে ব্যাট তুলে চাপা গলায় হুঁশিয়ারি দিল—"এখনি বেরিয়ে যাও, নয়তো মাথা ফাটিয়ে দেব।"

ধীরে এগিয়ে এসে গৌরীর থেকে দুহাত তফাতে দাঁড়িয়ে খুবই ক্লান্তস্বরে তারক বলল, "পাঁচলাখের একটা পেনিসিলিন কি যোগাড় করে দিতে পারনা ? তাহলে অসুখটা সারিয়ে ফেলতে পারি।"

ব্যাটটা তুলেই রয়েছে গৌরী। কিন্তু ওর চোখে স্পষ্টই বিভ্রান্তি। তারক হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে আলতো করে ব্যাটটা নিয়ে যত্ন ভরে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল। "বলের ছাপগুলো দেখছি ঠিক মাঝখানেই!" অস্ফুটে এই বলে তারক আবার গৌরীর সামনে দাঁড়াল।

"আমার চিঠিগুলো কি রেখে দিয়েছ?" গৌরী উদ্বিগ্ন স্বরে বলল।

"না। আমার বিয়ের দিনই পুড়িয়ে ফেলেছি।"

"ভালই করেছ," হাঁফ ছেড়ে স্নিগ্ধ হয়ে গেল গৌরী, "বৌয়ের হাতে পড়লে তোমার সুখশান্তি চিরকালের মত ঘুচে যেত। শুনেছি নাকি খুব সুন্দরী?"

"গৌরী তোমার মাথাতেও কাঁকর ঢুকেছে।"

"কথা ঘোরালে কি হবে, শুনেছি দারুণ দেখতে। একদিন নিয়ে এসো না।"

"কিন্তু তুমি এখন আমায় একটা পাঁচলাখ পেনিসিলিন দেবে।"

"ফাজলামো রাখো। এইভাবে বললে সত্যি সত্যিই কিন্তু মাথা ফাটিয়ে দেব বলছি।"

গৌরী হাসিহাসি মুখে চোখ পাকিয়ে মাথাটা ঈষৎ বাঁদিকে হেলিয়ে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা ব্যাটটার কাছে সরে গেল। হাত বাড়ালেই এখন সেটি তার মুঠোয় এসে যাবে।

"আমাকে কি সাহায্য করবে না গৌরী? এই হাঙ্গামার মধ্যেও তোমার কাছে এসেছি যখন, বুঝতেই পারছ তোমাকে কতখানি মনে রেখেছি! কিন্তু তুমি কি একদমই ভুলে গেলে?"

"ওসব কথা কি কেউ চিরকাল মনে করে রাখে নাকি? নাহ্ তোমার মাথায় ঠিকই কাঁকর ঢুকেছে নয়তো পেনিসিলিন চাইতে শেষে আমার কাছে এলে?"

"একদমই মনে নেই? একটুখানিও?"

"না, সত্যিই মনে পড়ে না। প্রথম প্রথম দু-চারদিন মনে পড়েছিল। তখন কিন্তু কষ্ট হত তোমার জন্য, একটুও মিথ্যে বলছি না।"

"কিন্তু এখন যদি এমন কিছু করি যাতে তুমি আর আমায় জীবনে ভুলতে পারবে না, যদি আমার অসুখটা তোমার মধ্যে ঢুকিয়েদি ?"

"তারমানে!" গৌরী অস্বাভাবিক চেঁচিয়ে উঠল এবং হাত বাড়িয়ে ব্যাটটা তুলে নিল। তারক ব্যাটটার দিকে তাকিয়ে তখন মনে মনে আবার বলল ঠিক মাঝখান দিয়েই বলগুলো খেলেছে।

"আমার কী এমন দায় পড়েছে যে তোমার মত একটা লোককে মনে করে রাখতে হবে ? তোমার মত লক্ষ লক্ষ লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে এই শহরে। তোমার কী এমন পরিচয় আছে যেজন্য তাদের থেকে আলাদা করে দেখব, মনে করে রাখব ? তুমি কে ?" গৌরী ব্যাটটা দুহাতে আঁকড়ে ধীরে ধীরে তুলল।

"আমি জানি, আমি কে।" এইবলে তখন তারক মাথাটা সামনে ঝোঁকাল এবং পতনরত বঙ্কুবিহারীর মত হাসিতে ঠোঁট দুটি মুচড়ে ক্রমশ আরো ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু যা চেয়েছে ঘটল না। অক্ষত মাথাটা তুলে সে দেখতে পেল, গৌরী চর্বিভরা বস্তার মত নিতম্ব দুটি টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছে আর সিড়ির মাথায় একটি বেঁটে মোটা লাঠি হাতে চাকরটি নির্নিমেষে তার দিকে তাকিয়ে।

সদর দরজা পার হয়ে রাস্তার পা দেওয়া মাত্র তারকের একবার ইচ্ছে হল গৌরীকে ডেকে বলতে, তোমার ছেলের হাতে খেলা আছে, ওকে উৎসাহিত কোরো। তারপর অনেক দূর এগিয়ে তারক একবার পিছু ফিরে তাকাল। রাস্তার মাঝখানে একটা লোক পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটা লাঠি। শূন্য রান করে প্যাভেলিয়ানে ফিরে আসার মত হাঁটতে হাঁটতে তারক টালা ব্রিজের দিকে চলল।

॥ এগারো ॥

টি, সিন্‌হা এইবার তুমি কি করবে, এখন তুমি কোথায় যাবে? নিজেকে এই প্রশ্ন করে তারক ব্রিজের ঠিক মাঝখানে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আবার পিছনে তাকাল। টালার জলের ট্যাঙ্কটা গাঢ়তর অন্ধকার হয়ে আকাশে খানিকটা গহ্বর সৃষ্টি করে রয়েছে। দূরের রাস্তার আলো টিমটিমে অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সামনে, গ্যালিফ স্ট্রীটের মোড়ের দিকে শুধুই অন্ধকার। একটু আগেই ওদিকে দপ্ করে সাদা আলো ঝলসে উঠে তিন-চারটি বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। ফটাস-ফটাস রাইফেলের শব্দও তারক পেয়েছে। আর এগোবে কিনা, সে বুঝে উঠতে পারছে না। এখন ওই অঞ্চলটি নিশ্চয় পুলিসের রাইফেলের আওতায়। ওইখান দিয়েই বাড়ী ফিরতে হবে এবং তখন টি, সিন্‌হার গুলিবিদ্ধ মৃতদেহটির রাস্তায় পড়ে যাওয়ার শতকরা আটানব্বই ভাগ সম্ভাবনা আছে।

তাহলে আমি কি সারারাত এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব? তারক মুখ ফিরিয়ে গৌরীর বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটার দিকে তাকাল। আলোগুলো দেখা যাচ্ছে, রাস্তাটা জনশূন্য। টি, সিন্‌হা তুমি টেকনিক জাননা। জানলে মুরগার মাংসে পাকস্থলী ভরিয়ে গৌরীর বাড়িতেই আজ নিরাপদে রাত কাটাতে পারতে। এমনকি গৌরীর বিছানাতে একশো রানও হাঁকাতে পারতে। কিন্তু তোমার মাথায় ছিল কাঁকরের চিন্তাটা। ভুল ব্যাট চালিয়ে এখন টালা ব্রিজের উপর ক্যাবলার মত দাঁড়িয়ে তুমি ভাবছ কেমন করে বাড়ি ফিরবে। তারক ভাবল, ব্র্যাডম্যান হলে কি গৌরী বার করে দিত?

"বল হরি, হরি বোল।"

আচমকা, ধীর গম্ভীর স্বরে, তারকের অদূরেই কারা ধ্বনি দিল। তারক সঙ্গে সঙ্গে জমাট বেঁধে গেল। হৃদপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত। ভয় এঁকেবেঁকে শিরদাঁড়ায় ওঠানামা করছে। অন্ধকারের মধ্যে একটা সাদা ছায়া তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতেই তারক ইউক্যালিপটাসের গন্ধ পেল। শববাহকরা তাকে দেখতে পায়নি। গন্ধটা হঠাৎ মনে পড়িয়ে দিল মাকে। তারক পুরো একটা শিশি মার গায়ে ঢেলে দিয়েছিল। শ্মশানে যাবার সারা পথটায় এই গন্ধটা তার ভাল লেগেছিল। মা একবার বলেছিল, 'তোর খেলা একদিনও তো দেখলুম না।'

"বল হরি, হরি বল।"

অনেকটা এগিয়ে গেছে, তাই ওদের ধীর গম্ভীর সমবেত কণ্ঠ বিষন্ন বিলাপধ্বনির মত তারকের কানে আঘাত করল। অভিভূতের মত সে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে গলে রাস্তায় নামল। এইবার? টি সিন্‌হা এইবার তুমি কী করবে? ওরা চলে যাচ্ছে, অনুসরণ করবে? তাহলে দাঁড়িয়ে থেকোনা। মৃতেরা অত্যন্ত সাহসী হয়। যদি ভয় পেয়ে থাক তাহলে ওর সঙ্গ নাও। তারপর তারক ভাবল, কিন্তু আমি ভয় পাব কাকে বা কি জন্য! এগারোজনের মধ্যে আসার সব সুযোগই আজ হারিয়েছি। সকাল থেকে মিস-ফিল্ড করে গেছি শুধ্। অনিতা, বঙ্কুবিহারী, রেনু, সলিল, গৌরী বহু রান তুলে নিয়েছে, ইঞ্জেকসান নেওয়াও ফসকেছি। এখন আমার ভয় পাওয়ার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু ইউক্যালিপটাসের গন্ধটা বড় ভাল।

তারকের মনে হল এগিয়ে গেলে গন্ধটা আবার সে ফিরে পাবে' তাই হাঁটতে শুরু করল। বহুদূরে পুলিশ অথবা মিলিটারি ট্রাকের হেডলাইটের আলো দুধারের বাড়িগুলোকে একবার অস্বচ্ছভাবে

ফুটিয়ে তুলেই নিভে গেল। অনেকদূরে আকাশের কিছুটায় পাটকেল রঙ ধরেছে। সামনের দিক থেকে চাপা গোলমালের শব্দ আসছে। কিন্তু তারক কিছুতেই গন্ধটা আর পাচ্ছে না। ক্রমশ সে দিশাহারা এলোমেলো বোধ করতে শুরু করল। কোথায় গেল ওরা? হেডলাইটের আলো যতটুকু জ্বলেছিল তারমধ্যে সামনের রাস্তায় কোন গতিশীল ঘনত্ব দৃষ্টিতে আসেনি।

টি, সিন্‌হা তাহলে! যদি তখনই ওদের সঙ্গ নিতে, তাহলে ইউক্যালিপটাসের গন্ধ অনুসরণ করে বিপজ্জনক এলাকাটি পার হয়ে যেতে পারতে। পুলিশ বা মিলিটারি নিশ্চয়, শবদেহ বা তার বাহকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামবে না। কিন্তু টি, সিন্‌হা তখন তুমি ইতস্তত করলে কেন? মৃতের দেহে ছড়ানো এই গন্ধ কি তুমি কখনো পাওনি? তারক মাথা ঝুঁকিয়ে বিষন্ন কণ্ঠে নিজেকে বলল, অন্ধকারে ওদের 'হরি বল' ধ্বনি আমায় অভিভূত করেছিল।

হেডলাইটের সন্ধানী আলো আবার জলে উঠল। তারক থমকে দাঁড়িয়েই ছুটে গিয়ে একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে আশ্রয় নিল। চোখ তুলে বারান্দায় জানলায়, ছাদে আবছা আবছা মুখ দেখতে পেল। মাঠের মাঝখান থেকে গ্যালারিতে সারিবদ্ধ মুখের মত দেখাচ্ছে। সেই মুহূর্তে পরপর দুটো বিস্ফোরণ ঘটল তার দুশো গজ দূরে।

"এ্যাই, এ্যাই মশাই, পালান। এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছেন?" উপর থেকে একজন চীৎকার করে উঠল। তারক মুখ তুলে কাতর স্বরে বলল, কোথায়? প্যাভেলিয়নে!

"আরে মশাই আপনাকে দেখতে পেলে যে ওরা এদিকেই ছুটে আসবে, বাড়ি বাড়ি হামলা করবে! পাশের গলিটা দিয়ে পালান। হাতজোড় করে বলছি, পালান।" তারকের পিছনেই জানলার একটা পাল্লা ফাঁক করে একজন বলল। তারক সেখান থেকে সরে

যেতে যেতে হতাশস্বরে বলল, কিন্তু সেকেণ্ড ইনিংস আমি আর পাবনা।

এনজিন চালু হবার শব্দ হল। তারক হাত তুলে তালুর রেখা-গুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে এখন। ট্রাকের চাকা ভাঙ্গাচোরা রাস্তায় আলোটাকে কাঁপাচ্ছে। কে একজন সামনের ছাদ থেকে বলল, "ইট মার ব্যাটাকে। মেরে ভাগা, নয়তো নড়বেনা।"

তারক থমকে দাঁড়াল। এইমাত্র ইটের একটা বড় খণ্ড তার সামনে পড়ে ভেঙ্গে ছড়িয়ে গেছে। একটা টুকরো ছিটকে দেয়ালে লেগে তার ছুঁচলো কোন্‌টি তুলে পায়ের কাছে স্থির:হয়ে। সেই তীক্ষ্ণতার দিকে তাকিয়ে তারক কেঁপে উঠে বলল, টি, সিন্‌হা কোথাও তোমার রেহাই নেই। তাহলে অসুখ সারিয়ে কী লাভ!

তারপর তারক পাশের অন্ধকার গলিতে ঢুকল। হাঁটতে হাঁটতে একসময় আলোজ্বলা একটা রাস্তায় পৌঁছল। তার দুধারের বাড়িগুলো জীর্ণ, হতশ্রী, দরিদ্র। কিন্তু রাস্তাটা নিরুদ্বিগ্ন, জনহীন, শব্দবিহীন। বোঝাই যায়না কিছুদূরেই ভয় দাপাদাপি করছে। মোড় ঘুরতেই টিউবওয়েল দেখে তারকের তৃষ্ণা পেল। প্রচুর জল খেয়ে তৃপ্ত হয়ে, রুমালে মুখ মুছতে মুছতে দেখল, টিনের চাল দেওয়া একটি বাড়ির দরজায় তিনজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। তাদের দিকে এগিয়ে গেল সে। তখন তাদের একজন সাদামাটা ভাবে বলল, "আসবে নাকি গো?"

তারক শোনামাত্র প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে নোটগুলো স্পর্শ করল। যা টাকা আছে তাতে তিন-চার কোটির পেনিসিলিন ইঞ্জেকসান নেওয়া যায়। আশ্বস্ত হয়ে সে বলল, "নিশ্চয়। কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে, আগে কিছু খেতে হবে। পাওয়া-টাওয়া যাবে তো?"